মা আনন্দময়ীর আগমনে

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

श्री श्री आनन्दमयी संघ
ॐ माँ
मातृ शरणं

মা আনন্দময়ীর আগমনে
প্রকাশক শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
প্রধান কার্য্যালয় ঃ কনখল, হরিদ্বার-২৪৯৪০৮

দ্বিতীয় প্রকাশঃ শুভ গুরুপূর্ণিমা, জুলাই ২০০৬
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ISBN 81-89558-21-8
মূল্য ঃ ৪০.০০

প্রচ্ছদ অঙ্কণ ঃ শ্রী চিত্তরঞ্জন পাকরাশী
মুদ্রক ঃ ইস্ট ওয়েষ্ট পাবলিকেশন
সি ১৪৮ গ্রেটার কৈলাশ -১
নতুন দিল্লী- ১১০০৪৮

প্রস্তাবনা

"শ্রী অরুন প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "মা আনন্দময়ীর আগমনে" পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ ১৯৪২-সনে- অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বছর আগে লক্ষ্ণৌ-এর ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রী মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ও শ্রীমার ক্রমবিকাশ ও স্ফুরনের ঐ অধ্যায়টিতে লেখক লক্ষ্ণৌতে একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে প্রায়ই লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে আসতেন এবং ভক্তদের সান্নিধ্যে একনাগারে কয়েকদিন বা সপ্তাহ কাটাতেন এবং তাঁদের জীবনের সুখ দুঃখ, ভয় ভীতি, ধর্মজীবনের কর্ত্তব্য ও দায় এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় —প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নের, নানা উপমা-সহ, জবাব দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক পথে টানবার প্রয়াস করতেন।

১৯৪২ সনে মা যখন লক্ষ্ণৌ-এ এসে গোমতী নদীর তীরে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছেন তখন শুধু সাধারণ ভক্তরাই নন, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, ডঃ পান্নালাল আই.সি.এস্ প্রভৃতি বিদ্বজ্জনেরাও মায়ের দরবারে এসে হাজির হতেন। ধর্মপিপাসু, ইতিহাস ও এবং ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরার অনুরাগী অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায় মায়ের স্বরূপটি জানবার ও তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্তির আশায় প্রায়ই 'মা'এর দরবারে পৌঁছে যেতেন। মা'য়ের সাথে যা কথাবার্ত্তা হতো বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন এবং মা'য়ের জবাব, মাতৃ বানীর অফুরন্ত অমৃতধারা, এবং

মাঝে মায়ের ভাব ও 'লীলা' তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল— সবকিছুই প্রতিদিন তাঁর 'দিনপত্রীতে' (Diary) লিখে রাখতেন। 'মা আনন্দময়ীর আগমনে' পুস্তকটির উৎস ঐ দিনপত্রীতে সযত্নে রক্ষিত তথ্যাবলি ও লেখকের মাতৃরূপ দর্শন ও মাতৃলীলার অনুভূতি ও উপলবদ্ধি।

এই পুস্তকের সবকটি অংশই সুখপাঠ্য। শেষের অংশে লেখকের ভাষায় মন্তব্যে এবং মাতৃস্বরূপের ব্যাখ্যায় এটা সুস্পষ্ট যে তিনিও মহাসাধক ভাইজীর মত বিশ্বাস করতেন যে মা আনন্দময়ী ছিলেন নিখিল ব্যাপিকা, বেদপ্রকাশিকা ও স্বয়ং প্রণবরূপিনী।

এই বহু পুরাতন অথচ চিরনুতন এবং মূল্যবান পুস্তকটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে আমরা শুধু মায়ের সেই বিদগ্ধ ভক্তের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাই নিবেদন করছিনা, শ্রীশ্রী মায়ের চরণেও জানাচ্ছি অজস্র প্রণাম আমাদের এই পুস্তকটি পুনমুদ্রনের প্রেরনা জোগানোর জন্য। সবইতো তাঁরই ইচ্ছা।

সুনীল গুহ
আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় প্রকাশন বিভাগ।

শুভ গুরুপূর্ণিমা
কনখল, জুলাই ২০০৬

প্রথম সংস্করণে

লেখকের নিবেদন

যাঁহারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে লক্ষ্ণৌএ দেখেন নাই বা আবার তাঁর দর্শন পেতে চান তাঁদের তৃপ্তির জন্য আমার ডায়েরীর কয়েকটি ছিন্নপত্র প্রকাশিত হইল। কষ্ট করিয়া বা চেষ্টা করিয়া এখানে কিছুই লেখা হয় নাই। যেমন যেমন ঘটিয়াছে ও তাহা যেরূপভাবে চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সব কথা যে বলা হইয়াছে বা কোনও কথা যে বাদ নাই, এমনও বলা চলে না। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথাগুলি লেখকের অন্তরে যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ঘরে ফিরিয়া সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার কথাগুলি ও তাঁহার বলিবার ভঙ্গিমা, লেখকের সামর্থ অনুয়ায়ী রক্ষিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য তাঁর স্বরূপ ও বাণীকে আরও আপনার করিয়া লওয়া। আশা করি সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি মার্জ্জনীয় হইবে।

পাণ্ডুলিপি হইতে রচনাটিকে উদ্ধার করিয়া পুস্তকের আকার দিবার দায়িত্ব ও ভার লইয়াছেন পুস্তক প্রকাশক ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ হইবে তাহা সমস্তই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মহিলা আশ্রমের তহবিলে জমা হইবে।

লক্ষ্ণৌ
মহাষ্টমী, অক্টোবর, ১৯৪২ } শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ (দর্শন ও শ্রবন)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ দর্শন	১
২ কথাবার্ত্তা	৫
৩ মাতাজীর দরবার সকালবেলা	২২
৪ মাতাজীর দরবার বৈকালবেলা	৩১
৫ মাতাজীর অদর্শনে	৪১

দ্বিতীয় ভাগ (স্মরণ ও চিন্তন)

১ ধর্ম্মজীবনের দুইটি বিশেষত্ব	৪৭
২ দ্বন্দ্বের সমাধান	৫৪
৩ মন্দির প্রতিষ্ঠা	৬৭
৪ ভক্তি ও যোগ	৭৬
৫ জ্ঞান ও কর্ম্ম	৮৭
৬ আপ-জ্যোতি-রস-অমৃতম্	১০১
৭ ধর্ম্মজীবনে বাধাবিঘ্নের গ্রন্থি খোলা ...	১০৩
৮ একটি অসমাপ্ত কাহিনী	১১২

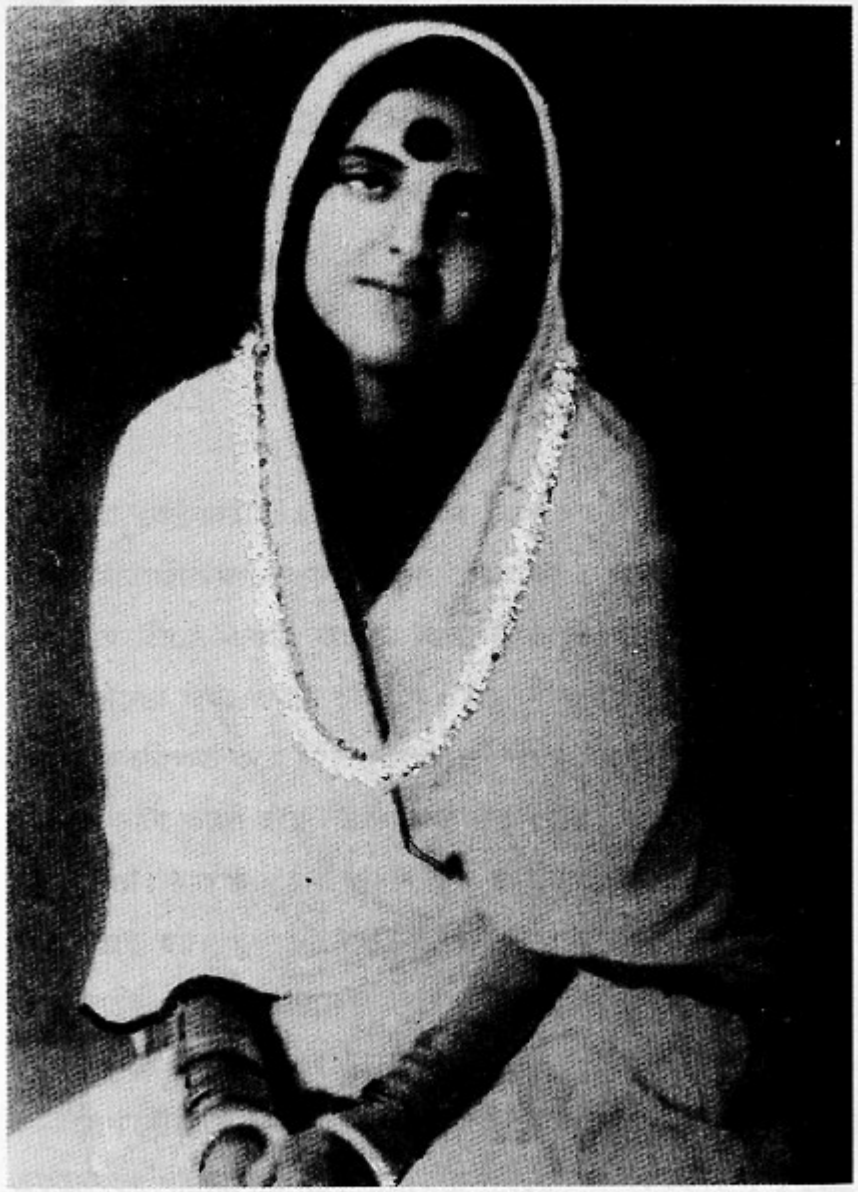

প্রথম ভাগ

(দর্শন ও শ্রবণ)

(১)

দর্শন

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪২। বৈকাল বেলা। কর্ম্মস্থান থেকে ফিরে এসেই মাতাজীর দর্শন পাবার জন্য বেরুলাম। পেপার মিলের কাছে, গোমতীর তীরে, একটি বাগানে মাতাজী তাঁবুর মধ্যে বাস করছেন শুনে দর্শনের জন্য তথায় চলিলাম। মনে নানাবিধ বিষয়-চিন্তা এসে মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। নদীতীরে পথ দিয়ে যেতে যেতে আবার মনটা তাজা হয়ে উঠল। তখনও রৌদ্র বেশ আছে। বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা। রাস্তায় দু'চার জন লোক যাতায়াত করছে। গাড়ীঘোড়া নাই বল্লেই হয়। একখানা মোটর পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি যে দিকে যাচ্ছি সেই দিক থেকেই এল। আমার দৃষ্টি সোজাসুজি মাতাজীর স্থানের দিকে। আমি চলেইছি।

সেখানে গিয়ে স্থানটি বেশ ভাল লাগল। কয়েকটি হিন্দুস্থানী ভক্ত একটা বৃহৎ শামিয়ানায় বসে মাতাজীর সম্বন্ধে গল্প করছেন। একটু দূরে একজনকার থাকবার মত একটি ছোট তাঁবু দেখা যাচ্ছে।

মাতাজীর সম্বন্ধে নানা কথা কানে এল। "তিনি ভক্ত নন, স্বয়ং ভগবান" ইত্যাদি। তাঁহারা আদর করে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাতাজীর সম্বন্ধে যা কিছু মন্তব্য করছিলেন শুনতে আমার ভালই লাগছিল। কে একজন এমেরিকান্ মহিলাকে শ্রী অরবিন্দ নাকি মাতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। তিনি কত ভক্তিভরে শাড়ী পরে দেখা করতে আসতেন। পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের মধ্যে ভক্তি, আমাদের মধ্যে তেমন শ্রদ্ধা নাই কেন? এই কথাবার্ত্তা শুনছিলাম।

আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। জানলাম—মাতাজী মোটরে করে বেরিয়েছেন। বুকের ভিতরটা ঝনাৎ করে উঠল। তবে কি সেই মোটরেই মাতাজী চলে গেছেন? আমার পথেই তো পড়েছিল! উঠে গিয়ে বাগানে একটু বেড়ালাম। বাগানের সঙ্গে নদীর উপর একটি প্রাইভেট ঘাট আছে। সেইখানে কতক দাঁড়ালাম। সূর্য্য অস্ত যাবার সময় হোল। পাখীরা নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। দু'চারটি করে আরও লোকের ভিড় জমে উঠতে লাগল। ভাবলাম তাঁবুতে গিয়ে বসি।

সেখানে যেতেই একটি যুবক, মাথায় অনেক চুল, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুনলাম, মাতাজীর সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়ান। তিনি আর একটি যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। "চারবাক্ প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর আস্থা স্থাপন করতেন, ন্যায়শাস্ত্র অনুমানের উপর জোর দিয়েছে। সব ঠিক। এ ছাড়া আরও পথ আছে। Fourth Dimension সম্বন্ধে এখনও ঠিক হোল না। একবার প্রমাণ হলে তখন ত শামিয়ানা থাকতেই এটা ফুঁড়ে ওদিকে গিয়ে বেরুনো যাবে।" ইত্যাদি। আমার মন মাতাজীর দর্শন চিন্তায় নিবিষ্ট। পথের মধ্যে তো দেখা হয়। কিন্তু আমার তো সাধন ভজন কিছু নাই। তাই দেখা হয়েও দেখা হয়না! শুনলাম ঐ

যুবকটি মাতাজীর সম্বন্ধে বাংলায় একখানি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর কাছ ঘেঁসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ও বইখানি একটিবার চাইলাম। তখনও একটু আলো ছিল। আলো থাকতে থাকতে একবার চাইলাম। যুবকটি এনে দিলেন। বইখানির উপর যুবকটির নাম শুধু "অভয়" লেখা আছে। পাতা উল্টাতে গিয়া মাতাজীর ছবি চোখে পড়ল। ছবিটা এক মনে দেখ্‌তে লাগলাম। খুব ভাল লাগল। ছবিতে প্রথম দর্শন হয়ে গেল। আলো কমে আসছিল। পড়তে আর ইচ্ছা হোল না। যা পেলাম তাই নিয়ে বসে রইলাম।

মোটরের শব্দ কানে এল। সকলে বল্লেন, মাতাজী আসছেন। মনটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। গোধুলির শেষ আলোটুকুতে মাতাজী প্রকাশ হলেন। ছবির চেয়ে রোগা লাগ্‌ল। মাথার চুল খোলা, গায়ে শাল জড়ানো, পরণে শাদা কাপড়। তাঁবুতে তাঁর জন্য একটা বিশেষ আসন পাতা হোল, সেইখানে তাঁকে বসানো হোল। জোশীজী (Retired Inspector of Schools) কিটসনের একটা বড় আলো এনে যথাস্থানে রাখলেন। বল্লেন "মাতাজী দিয়া জ্বালা হয়েছে।" বলেই দুর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সন্ধ্যার প্রণামটুকু তিনি একাই সাঙ্গ করলেন না। আমাদের সকলের মাথা নত হোল। যিনি অন্ধকারের পারে, জ্যোতির্ম্ময়, তাঁর উদ্দেশ্যে অজানা পথের কয়েক জন পথিক মাতাজীকে লক্ষ্য করে সেই অসীম দেবতার চরণেই বন্দনা জানালেন।

আমি তাঁবুর একটি পাশে বসেছিলাম। যথেষ্ট শীতবস্ত্র গায়ে ছিল না। মনে করে বেরিয়েছিলাম যে দিনের আলোতেই বাড়ী ফিরতে পারব। তাই নিয়ে যাই নি। অভয় আমাকে বল্লেন, "আপনি আর একটু এগিয়ে এসে বসুন না!" আমি বল্লাম, "শীঘ্র পালাব বলে এক পাশে বসে আছি।" অভয় বল্লেন, "পালাবেন কেন?" আমি বল্লাম, "ঠাণ্ডা

পড়ছে কিনা। দেখ্‌ছেন না, বেশ ঠাণ্ডাবাতাস দিতে আরম্ভ করেছে। আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে।" অভয় উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন, "মা, ইনি বল্‌ছেন, ঠাণ্ডা লাগবে তাই শীঘ্র পালাবেন।" শ্রীশ্রী মা শুনতে পেয়ে একমুখ হেসে বল্লেন, "হাঁ ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে কেন?" আমার প্রতি প্রশ্ন করলেন, "বাবা ঠাণ্ডা লাগে কোথায়? সেখানে কি ঠাণ্ডা গরম কিছু আছে?" তাঁর হাসিটুকু মনকে স্নিগ্ধ করে দিল।

কয়েক জন মালা নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। একটির পর একটি মালা মাতাজীর গলায় শোভা দিতে লাগল। তাঁর কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখলাম না। সেইরূপ মুখে প্রসন্নতার হাসি লেগেই আছে, মাথাটা একটু পেছনদিকে ঝুঁকে আছে। শরীরটা প্রায় স্থির হয়েই আছে। চোখদুটি সকলের দিকেই। তবে কা'কে দেখছেন বুঝতে পারা গেল না। কিংবা হয়ত নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছেন, তা'ও বোঝা যায় না।

হিন্দুস্থানী মহিলারা তাঁর কাছে ঘনিষ্টভাবে বসলেন। আমার খুব ভাল লাগল। একটি মহিলাকে আলাদা দেখে তৃপ্তি হয় না। ভারতবর্ষের সকল মেয়েকে ও তাঁদের সাধনস্বরূপের উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম জানালাম। মাতাজীকে আর পৃথক করে প্রণাম করবার কথা মনে এলো না। আমি চুপ করে পাশ কাটিয়ে, তাঁবু থেকে যতদূর সম্ভব সকলের অলক্ষ্যে, চোরের মত প্রস্থান করলাম। অন্তরে রয়ে গেল আমার চোরাই মাল। মায়ের ছবিখানি সেখানে মুদ্রিত হয়ে গেল। মনে হোল, হয়ত এ ছবি কাল প্রভাতে নূতন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তা'ও যদি হয়, এও আমার পক্ষে অনেক নয় কি? ভগবানের দর্শন যাঁরা পান তাঁদের ভিতর দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই, এই

মনে করে সেখানে যত নরনারী বালক বালিকা বসেছিলেন সকলের উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণাম জানিয়ে, সেখানকার আলো থেকে আমি বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে দেখলাম আকাশে প্রতিপদের চাঁদ নদীর জলের উপর ঝিক্ ঝিক্ করে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার মনটা কি স্থির না অস্থির? আর কি ঠাণ্ডা লাগবে? কত কথা, কত চিন্তা কত আবেগ, মনের মধ্যে উঠ্‌তে লাগল। আর ঐ ছোট্ট নদী গোমতী যেমন নীরবে বয়ে যাচ্ছে আমিও সেই মত ভেসে চল্লাম, ঘরের পানে।

(২)

কথাবার্ত্তা

পরের দিন। ভোরে উঠে মনে হোল, আর মাতাজীর কাছে যাব না। কি হবে? নিজের দৈন্যের বোঝা নিয়ে চুপ করে নিভৃতে পড়ে থাকাই ভাল। কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে এসেই একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। জল খাবার খেয়েই ছুটলাম, সেই নদীর ধারের সেই বাড়ীতে, সেই মাতৃস্বরূপিণী মূর্ত্তির কাছে, যাঁর স্বরূপটি আমার মত অস্থির-প্রকৃতির-মানুষটির অন্তর সারাদিন অলক্ষ্যে ভরেছিল।

গিয়ে দেখি নদীর ধারে ঘাটটিতে এক গাদা লোকের মধ্যে বসে রয়েছেন মাতাজী। লোকগুলি যেন মিলে মিশে ফুলের মালার মত তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। আকাশে যথেষ্ট রৌদ্র : নদীর জল হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। আমার সলজ্জভাব সহজেই কেটে গেল। একটু যেন মুখর হয়ে পড়লাম। ঐত আমার দোষ! যখন চুপ করে ভাল ছেলেটির মত এগুনো ভাল, আমি তখন বেশী কথা কইতে চাই।

আর যখন কথা বলবার সময় আসে তখন চুপ করে সবটুকু জানাতে চাই। কোথায় যে কথা বলার ও চুপ করে থাকবার সীমানা তা' আমার মনেই থাকে না।

প্রণাম করতে ভুলে গেলাম। হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে সতরঞ্চির উপর বসে পড়ে দেখি মাতাজীও হাত জোড় করে রয়েছেন। ভালও লাগল, আবার লজ্জিতও হোলাম। লজ্জার ভাব গোপন করে বল্লাম, "মাতাজী কাল অতো শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে পালালাম, পথে কিন্তু বারবার মনে হোল, না জানি কত অপরাধ হয়ে থাকবে, কাল যদি আবার আসা হয়, এ রকম আর হতে দেব না। আজ পথে আসতে আসতে ভাবলাম, কাল যেমন আমি সব প্রথমে উঠে গিয়েছিলাম আজ আমি সবাইএর আগে গিয়ে উপস্থিত হ'ব। কিন্তু দেখছি আমার আগে এঁরা সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

সকলেই মৃদু মৃদু হেসে উঠলেন। মাতাজী বল্লেন, "বাবা, মেয়ের কাছে বাবা আসবে, এতে সব আগে, সব শেষে, কি আছে? আচ্ছা বলত, কাকে তুমি সব আগে বা সব শেষে বলো? সব আগে সব শেষে বলে কি কিছু আছে? আবার আছেও বটে। কিন্তু সত্যিকার বল্‌তে গেলে যা সব আগে তাইত সব শেষে। আবার মধ্যেও তাই নয় কি?

আমি একটু অপরাধীর সুরে কথাটা নিজের তরফ থেকে ব্যক্তিগত করতে গিয়ে বল্লাম, "তা নয় মাতাজী, কাল আমি আগে থেকেই এসেছিলাম, তারপর এসেই যখন শুনলাম, আপনি মোটরে কোথাও গিয়েছেন তখন ভারি কষ্ট হোল। আমি এতদূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম, আর মাতাজী কি না টপ্ করে মোটরে করে কোথায় চলে গেলেন! তা'ও পথ দিয়ে মোটর চলে গেল অথচ আমি তাঁকে দেখতেও পেলাম না!"

মাতাজী বল্লেন, "তোমাকে কিন্তু দেখা গিয়েছিল। আর তখনই বোঝা গিয়েছিল যে তুমি এখানেই আসছিলে।"

আমি একটু স্তম্ভিত হলাম। মোটরে চড়ে যাঁরা যান তাঁরা ত পথের হেঁটে চলা পথিকদের দেখ্‌তে পান না। মাতাজী আমাকে জানেন না, চেনেন না, তবে জানলেনই বা কেমন করে, চিনলেনই বা কেমন করে, আর দেখ্‌লেনই বা কেমন করে? আমি যখন মোটরে বসে যাই আমিও ত পথে হাঁটা মানুষদের দেখবার অবসর পাই না। একি হোল? তবে কি মাতাজী অমাদের চেয়ে পৃথক? ঐ যে আমার সামনে খোলা চুল, শাল গায়ে দিয়ে, হাসিমুখে ভদ্র মহিলা বসে আছেন, ওঁকে আমাদের থেকে পৃথক করতে আমার একটুও ইচ্ছা করল না। মাতাকে সন্তান যেমন আলাদা দেখ্‌তে পারে না, আমি ও তেমনই পারলাম না।

মাতাজী হাসিমুখে বল্লেন, "বাবা, পিতাপুত্রীর মধ্যে দূরত্ব কি আছে?

মনের মধ্যে দেখলাম, তাইত, মাতাজী পুত্রী হয়ে গেলেন, আমরা সবাই পিতার আসনে উঠে গেলাম। সত্যই ত, তিনি সংসারের পুত্রী, সারা সংসার তাঁর পিতা। সংসার বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হয়ে মৃত্যুমুখে পড়ে। পুত্রী চিরকাল নবীনা থাকেন, অমৃতময়ী হয়ে থাকেন। আর সারা সংসার তাইত চায়। আমারও মনটা আশীর্ব্বাদে ভরে উঠ্‌ল। কিন্তু কে কা'কে আশীর্ব্বাদ করে? কাল যাঁকে বিশেষ করে প্রণাম করতে পেলাম না বলে পরে মনে অনুশোচনা হয়েছিল আজ তাঁকেই আশীর্ব্বাদ করতে পেলে বাঁচি, এমনই ভাবে মনে এল? এ যেন ঐ নদীর বুকে লহরের পর লহর যেমন উঠ্‌ছে আর পড়ছে তেমনই ভাবে। কিন্তু তারই ভিতর দিয়া নদীর প্রাণ এগুতে থাকছে। আমারও মনের

ওঠাপড়ার সত্ত্বেও আমার প্রাণটা এগুতে চাইল। দেখ্‌লাম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবু ওঠবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মনে হোল, হয়ত আমার চপলতা তাঁর ভাল লাগছিল না। মনকে সংগ্রহ করে ভাবলাম, আচ্ছা, এবার চুপ করে থাকব, তাইত, অপর সবারও ত কথা কইবার আছে।

রাধাকুমুদ বাবু কাছে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সকলের দৃষ্টি মাতাজীর উপর। আমি কেবল নদীর পানে চেয়ে বসে রইলাম। কিন্তু সবাই নীরব। এত চুপচাপ আমার ভাল লাগ্‌ল না। মাতাজীর মুখের দিকে চাইলাম। আমার চুপ করে থাকবার ইচ্ছা কোথায় লোপ পেয়ে গেল। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না! চেয়েও থাক্‌ব, অথচ কথাও ক'ব না। এত সংযম আমি কোথায় পাব? আমিই আরম্ভ করলাম, বল্লাম, "মাতাজী, আজ সকালে গীতা পড়তে পড়তে একটা শ্লোক, যা' পূর্ব্বেও অনেকবার পড়েছি, তার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। শ্রীভগবান্ বলেছেন, "সর্ব্বধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ।" মাতাজী, শ্রীভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন কেন? আমি ত জানি, অধর্ম্মকে ত্যাগ করে ভগবানের কাছে যাবার উপায় হয়, এখানে ধর্ম্মকে ত্যাগ করতে বলা হোল কেন? শুনুন শ্লোকটার এই অংশ বলি।" এই বলে বাঙলা অর্থ টুকুও নিজের কাছেই আওড়াতে লাগলাম, মাতাজীর মুখপানে চেয়ে।

মাতাজী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমারই মনের কথা বল্লেন, "বাবা, গ্রন্থ ত পড়া নেই। যেমন আসে, তেমনই বলা হয়। কেমন নয়?

এ তো আমারই মনের কথা। তবে মাতজীর মুখে শুনে আরও

ভাল লাগ্‌ল। যিনি উত্তর জানেন ও পেয়েছেন তাঁর মুখে এ'টা সহজ কথা। আমার মুখে সহজ নয়। কারণ আমি গ্রন্থ পড়ি। যখন কিছু বুঝি সেটা আমার নিজের গুণে বুঝি, আর যেটা বুঝতে পারি না সেটা গন্থের দোষ, আমার নয়। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা' বলেন, আমি বুঝতে পারলেই সেটা আর শ্রীকৃষ্ণের কথা নয়। সেটা আমার মনের কথা তিনি চুরি করে বলেছেন মাত্র। আর যেটা আমি বুঝতে পারছি না, সে সব কথা তিনি যে বলেছেন, তা'তে তাঁর কিছু ভাল হয় নাই, কারণ আমি যখন বুঝলাম না তখন নিশ্চয়ই সে কথায় গোল আছে। এইরূপ বুদ্ধিতে আমি কোথায় পড়ে আছি ও মাতাজী কোথায় রয়েছেন। তাই যে কথাটি আমার নিজের মুখে বলা উচিত ছিল তা তিনি আমার অন্তরে প্রকাশ করে দিলেন।

মাতাজী বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, ধর্ম্ম বল্‌তে কি বোঝায়? এই দেখ না, নদীর একটা ধর্ম্ম আছে, আছে ত? ঐ ফুল গাছের একটা ধর্ম্ম আছে ত, কেমন , বল? "

আমি সম্মতি জানালাম।

মাতাজী বল্লেন, "সেই রকম মানুষেরও ত ধর্ম্ম আছে, কেমন কি না? একটা ধর্ম্ম কেন? সে যে পরিবারের মানুষ, তার একটা ধর্ম্ম থাকতে পারে। আবার সমাজের একটা ধর্ম্ম থাকতে পারে।"

আমি বল্লাম, "তা'ত থাকবেই, মতাজী, কথায় বলে কুল ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম, দেশাত্মক ধর্ম্ম, শাশ্বত ধর্ম্ম, ইত্যাদি।"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তবেই বল, তারপর হিন্দু, মসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি আবার সাম্প্রাদায়িক ধর্ম্ম রয়েছে। কেমন নয়? এখন মানুষ কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখ্‌বে বল?"

একটু থেমে বল্লেন, "তাই এখানে বলা হয়েছে, শরণাগত হবার কথা। শরণ লওয়া কাকে বলে? যখন মানুষ আর তাঁকে ভিন্ন জানে না, কেমন ত? তাঁর শরণ নিতে হলে কি দরকার? আমি যা

ধরে আছি সব ত আমাকে ছাড়তে হবে? তবেই ত তিনি আমাকে ধরতে পারবেন? তারপর যেই জানব, তিনিই ধরে আছেন, তখন ত সব ধরা ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তিনিই ত সব। সব ছাড়া কি, বাবা, তিনি আছেন? তুমিই বল, এই সবই ত তিনি?" এই বলে আকাশ থেকে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত হাত বাড়িয়ে দেখালেন।

"দেখ বাবা, আর একটি কথা। এখানে বলা হয়েছে একম্। অর্থাৎ এককে। ভিন্ন ভিন্নকে নয়। সেই এক কোথায়? তিনিই ত এই সকলের অন্তর জুড়ে রয়েছেন।"

আমি আমার অন্তর খুঁজে আবার চক্ষু মেলে মাতাজীর দিকে দেখ্‌তে লাগলাম।

মাতাজী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন," কেমন বাবা, হোল ত?"

যেটুকু অর্থ কথায় ছিল না তা' তাঁর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হোল। আমিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, প্রশ্ন তিনিই দেন্, আর উত্তরও তাঁর কাছ থেকেই আসে।"

আমি ভাবলাম, তবে কি মাতাজী নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন? না তাঁর স্বরূপ আমার কাছে আরও প্রসার লাভ করছে? কিন্তু সামনে মাতাজীকে রেখে ভাববার সময় নাই। আমি বল্লাম,"মাতাজী, সকালে যিনি মনের মধ্যে প্রশ্ন দিয়েছিলেন, আশা করে বসেছিলাম, সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই তিনিই যদি দয়া করে উত্তর দেন। তাতো হয়ে গেল। এখন বলুন দেখি, এসব গ্রন্থ ট্রন্থ পড়া ভাল কি?"

মাতাজী উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, "হাঁ খুব ভাল। সব ভাল গ্রন্থ পড়বে। ভাল কি জান? যা তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর কথা

বলবে, তাঁর কথা ভাববে তাঁর কথাই শোনবার চেষ্টা করবে। তিনিময় হয়ে থাকবে, বাবা। তিনি তুমি কি আলাদা, বাবা? তুমি তাঁর, তিনি তোমার এও যেমন কথা, আবার তুমি তিনি ও তিনি তুমি এ'ও ঠিক সেই একই কথা।"

রূপ কথার গল্পের মত সোনার কাঠী কে যেন আমার অন্তরে বুলিয়ে গেল। তার হাতখানি দেখ্‌তে পেলাম না। কিন্তু সমস্ত অন্তর উন্মত্ত হয়ে, মাতাল হয়ে উঠ্‌ল। আবার শিশুর মত চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করল, যদি আবার পরশ পাই।

আমি বল্লাম, "মাতাজী, এ কিন্তু বড় কষ্ট। যত পড়ব, ততই মনে প্রশ্ন উঠ্‌বে, একটার পর আর একটা। এর তো শেষ নাই। তারপর উত্তরের জন্য বসে থাকতে হবে। আজ যেমন প্রশ্ন উঠল, আজই উত্তর এল, এমন ত আর রোজ হবে না? তবে বলুন দেখি, এ কি রকম দগ্ধানি?"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "হাঁ বাবা, এ দগ্ধানি ভাল। আর সবের চেয়ে ভাল নয় কি? তুমিই বল, ভাল লাগে না কি?"

একটু থেমে বল্লেন, "অন্তরে যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে, তারপর যা' হ'বার হউক্ না। তা'তে কি আসে যায়। দেখ বাবা, তুমি পড়বে, খুব পড়বে। তবে একটা কথা মনে রাখবে, নির্জ্জনে ভাবাও চাই। ঐ দেখ না, চাষীরা যখন বীচি পোঁতে, কত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। কত দিন ফেলে রাখে, রৌদ্রে দেয়, তারপর যখন পোঁতে, কখনও মাটির উপর ভাগেই, আবার কখনও বা গর্ত্ত করে। আবার কি আশ্চর্য্য দেখ, যখন গাছ হয়, কেউবা একবার ফসল দিয়ে শেষ হয়ে যায় যেমন ধান গাছ, আবার কেউবা বড় গাছ হয়ে অনেক বৎসর ধরে ফল দেয়। এই জন্যে বোঝা যায় না কি, যে সবাইএর জন্য এক রকম নিয়ম হতে পারে না?"

আবার বল্‌তে লাগলেন, "কিন্তু সব সময়েই মনে রাখবে বাবা, তোমার জীবন কিছু একটা আলাদা নয়। এ, যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, আর পাচ্ছ না, যা তোমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে ও প্রকাশ পাচ্ছে না এ সমস্তই তোমার জীবন। তোমার শত্রু যে সেও তোমার বলেই তো শত্রু?

মাতাজী হাসলেন। যীশুর কথা "Love your enemy" আমার অন্তরে বেজে উঠ্‌ল ও এই মহাবাক্যের একটা নূতন অর্থ চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল কী আশ্চর্য্য ! মাতাজী কি মনের কথা বুঝেছিলেন? তিনি বল্লেন, "দেখ বাবা, গির্জ্জায় যাবে, মন্দিরে যাবে, যেখানে তাঁকে পাবে যাবে, সব তোমার, সব তুমি। কেমন, বল, নয় কি?"

আমি বল্লাম, "গোড়ার কথা আপনি যা' বলেছেন আমি ত তার সম্বন্ধে ভেবে এখনও কূল কিনারা পাচ্ছি না। যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকে এই কথাই ত বল্লেন? আমার শ্রদ্ধা হোল কি না সে তো ভগবান্ নিশ্চয়ই বোঝেন। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো যে আমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস হলো? কথাটা নিজের দিক্ থেকেই বুঝতে চেষ্টা করছি।"

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, ক্রমশঃ নিজেই বুঝতে পারবে। একেবারেই সমস্ত কথা বোঝা যায় না। তবে প্রথম প্রথম দেখা যায় যত বেশী ভাল লাগে, যত খানিক আনন্দ হয়, তা পাবার জন্যে, তার চেয়েও বেশী পাবার জন্যে, ইচ্ছা করে। তখনই জানবে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ঠিক হয়েছে। আর যতক্ষণ না এমনটি হবে, ততক্ষণ কি চুপ করে বসে থাকতে পারবে?"

মাতাজী বলতে লাগলেন, "কিন্তু একথা ভুলো না বাবা, তিনিই দে'ন, তিনিই পান; দেওয়া পাওয়া কী আছে তখন তাও আর জানবার থাকে না।" মাতাজী চক্ষু অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

তাইত! আমি একাই কথা বলে যাচ্ছি। ভিড়ের মধ্যে আরও কতজন হয়ত কথা বলবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন! মাতাজী নিজেই আরম্ভ করলেন, "তবে পড়াশুনার সঙ্গে ক্রিয়াও চাই। ক্রিয়া কী জান?—স্তব, স্তুতি, জপ, নির্জ্জনে চিন্তা করা।"

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। একজন স্বামিজী এসে জানালেন যে কলিকাতা হইতে একটি ভদ্রলোক এসে পৌছেছেন ও তাঁর কি যেন প্রাইভেট জরুরী কথা বলবার আছে। তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, মাতাজী উঠে যাবেন কি আমরা সকলে উঠে যাব? সকলেই এক বাক্যে সাব্যস্ত করলেন যে আমরা উঠে গিয়ে কালকের সেই শামিয়ানায় অপেক্ষা করব। মাতাজী সম্মতি দিয়ে বসে রইলেন।

আমি উঠে গিয়ে স্বামিজীকে ধরলাম। বল্লাম, "চলুন আমরা কথাবার্ত্তা কই।"

স্বামিজী বল্লেন, "সে কি কথা, মা'র পর আমি কী বল্‌ব?

আমি বল্লাম, "আমিই না হয় আপনাকে বল্‌ব আর আপনি শুনবেন। চলুন ত?"

স্বামিজী খুব হেসে বল্লেন, "সে বেশ কথা।" তারপর আমরা শামিয়ানায় গিয়ে একটি নির্জ্জন প্রান্তে বসে, দু'টি অনেকদিনের পরিচিত ভাইএর মত, কত কথাই কইলাম। নদীর কূলে, আকাশের গায়ে, সে সব কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কি না, কে জানে? আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল। সে সব আধ্যাত্মিক কথা নহে। মাতাজী কাশীতে, গঙ্গা বক্ষে, নৌকায় কতদিন ছিলেন, মৈনপুরী কেমন লাগল, লক্ষ্ণৌএ এখন কতদিন থাকবেন, তারপর কোথায় যাবেন, তাঁর রোজ নামচা রাখা হয় কি না, তাঁর পক্ষ থেকে কোন মাসিক পত্র বাহির হয় কি না

ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে যাহা জানলাম তা'তে মনে হোল মাতাজী এসব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কোন কিছুরই চেষ্টা তাঁর নাই। কাল কোথায় থাকবেন তা' ঠিক করা থাকে না, উনি নিজেও বলেন না। হিন্দুস্থানী বড় ঘরের মেয়েরা এসে জমা হতে লাগলেন। সকলেই দেখ্‌লাম, ভারে ভারে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে আসছেন। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল।

শামিয়ানায় লোক ধরে না। এত বেশী লোক আসছে দেখে আমি একটু ব্যস্ত হলাম। স্বামিজী কী কাজে অন্যত্র গেলেন। আমিও একবার উঠে দেখ্‌লাম মাতাজী সেই দিকে আসছেন। আমি মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাতাজী বল্লেন, "কি বাবা, এখনই চল্লে?" এমনই সরল ভাবে বল্লেন যে আমার উদ্বিগ্ন মন সরল হয়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম, "না মা, আজ গায়ের কাপড় এনেছি। আজ খানিকক্ষণ বস্‌ব। তবে দেখুন, আমার মা আপনার কাছে আসতে চেয়েছেন, কাল সকালের দিকে আপনার কাছে আন্‌ব।

মাতাজী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শামিয়ানায় গিয়ে মহিলাদের কাছটিতে মাতাজী বসলেন। একটু তফাতে পুরুষরা সব বসলেন। আমি পুরুষ ও মেয়েদের মাঝামাঝি, সব পেছনে বসলাম। তবে ঠিক আমার সম্মুখেই আর এক প্রান্তে বিশিষ্ট আসনে সমতল ভূমিতে সকলের সঙ্গে আসীনা মাতাজী সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে রইলেন। যোশীজী আলো জ্বেলে উচ্চৈঃস্বরে প্রণাম জানিয়ে, তাঁর পরিচিত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় চীৎকার করে মাতাজীকে জানাতে লাগলেন। এ সব কথা বলা বাহুল্য। কারণ আমার মনের মধ্যে মাতাজীর কথাগুলিই বেশী করে বাজছিল, আর সব ভাল লাগছিল কিন্তু মনের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছিল না। লোকেদের আসা যাওয়া,

মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি, দু'একজন মাতাজীর অনুগত ব্যক্তির মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে আদেশ চাওয়া কিছুই আমার অন্তরে প্রবেশ করছিল না। আমার মনের দরজা কতকটা খোলা ছিল বটে, কিন্তু নিভৃতে আমি তখনও বোধ হয় আমার মনের ভিতরকার মাতাজীর সহিত কথা কইছি কিংবা আরও শোনবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ দেখ্‌লাম, সবই চুপচাপ। সন্ধ্যা নেমে আসছে। মাতাজীর মাথা দুলচে। জগতের খবর আমি তখন জানি না। মাতাজীর চোখদুটি কি একটুখানিক বুজে গেল? কিংবা হয়ত আমার দেখ্‌তে ভুল হোল। জগতের মাতা যিনি তিনিও কি সন্ধ্যার আগমনে একটুখানিক চক্ষু মুদ্রিত করে নিলেন? মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াবার পুর্ব্বে কি নিজেও একটুখানিক ঘুমিয়ে পড়েন? আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসে নাই। মাতাজীও চক্ষু মেলিলেন। সবাই চুপচাপ দেখে আমাকেই আরম্ভ করতে হোল। আমি বল্লাম, "মাতাজী, আচ্ছা, ধর্ম্মজীবনের জন্য ঘুমটা ভাল কি? অবশ্য আমি কিছু না ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

মাতাজী বল্লেন, "তা বেশ করেছ বাবা। দেখ বাবা, ঘুম সবইএর পক্ষে সমান ত হয় না, শিশুরা কত বেশী ঘুমায়, তারপর বয়স হতে হতে ঘুম যায় ও বৃদ্ধদের অনেকের দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঘুম হতেই চায় না, ঘুমের জন্য সাধনা করতে হয়। যার যেমন দরকার তার তেমনই ঘুম হওয়া চাই ত?"

আমি সম্মতি জানিয়ে বল্লাম, " কিন্তু ধর্ম্ম সাধনকালে ঘুমের প্রয়োজন নাই বলে ধরব কি?"

মাতাজী বল্লেন, "তা ধরবে কেন বাবা? এইত বলা হোল সব লোকের কথা ত একরকম হতে পারে না। পারে কি?"

আমি বল্লাম, "মাতাজী ঘুমের মধ্যে যে সুষুপ্তি আছে তা কি কল্যাণপ্রদ?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ সে ত বেশ অবস্থা। কিন্তু জেগে থাকা আরও ভালও অবস্থা নহে কি?"

আমি বল্লাম, "জাগ্রত অবস্থায়ও সুষুপ্তি হয় ত?"

মাতাজী বল্লেনম, "হয় বৈকি, দেখ বাবা, জাগ্রত-সুষুপ্তি ঘুমন্ত অবস্থার সুষুপ্তির চেয়ে অনেক ভাল।"

কথাটা কেহ কেহ আবার শুনতে চাওয়ায় মাতাজী আবার বল্লেন। তারপর বল্লেন, "এইত আসছে বাবা যে জাগ্রত সুষুপ্তির কাছে ঘুমানো সুষুপ্তির মূল্য অর্দ্ধেক। তা'হলে জেগে থেকে সুষুপ্তিতে থাকাই বেশী ভাল নহে কি?"

কাছে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি ভদ্র মহিলা অস্ফুটস্বরে বল্লেন, "আপনি ত স্বপ্নের কথা কিছু বল্লেন না। আমার কিন্তু স্বপ্ন বড় ভাল লাগে। আমি স্বপ্নে প্রায়ই কালী ঠাকুর, শিব ঠাকুর, সব দেখি। খুব ভাল লাগে। কিন্তু এ'ও দেখেছি যে রাত্রে শোবার সময় কিছু না ভেবে শুই সে রাত্র তো দেখ্‌তে পাইনা।"

মাতাজী বল্লেন, "তুমি ঠাকুর দেবতাদের স্বপ্নে দেখ্‌তে পাও? সে ত খুব ভাল কথা। অন্য কিছু দেখবার চেয়ে ঠাকুর দেবতা দেখলে বেশী আনন্দ হয় না?" তারপর সমস্ত তাঁবুটা নিরীক্ষণ করে, একটা যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের বুদ্ধির গোচরে আনবার জন্য বল্লেন, "কিন্তু স্বপ্ন ত স্বপ্নই বটে। স্বপ্ন তো ভেঙ্গে যায়, ভেঙ্গে যায় না কি? তারপর এই যে সবটা, এও ত একটা স্বপ্ন। এও ত ভেঙ্গে যাবে?"

কথাটা শুনেই আমার চমক লাগল, আমি বল্লাম, "মাতাজী,

তবে কিএক সময় জেগে উঠে দেখ্‌ব, আর এক যায়গায় জেগে উঠলাম, আর এ সমস্ত বৈচিত্র স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে।"

মাতাজী বল্লেন, "বাবা, সেতো হবেই। এ স্বপ্ন ত একদিন ভাঙ্গবেই। এর চেয়ে বড় একটা বৈচিত্রের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গবে। আচ্ছা তুমিই বল, এ জীবনেই কি ঠিক এমনতর হয় না?"

মাতাজী আবার আমাকে কোথা থেকে টেনে এনে সেই তাঁবুতে তাঁর কোলের কাছটিতে বসালেন। হঠাৎ ভূত দেখ্‌লে শিশু যেমন মায়ের বুকের মধ্যে আরও কাছে গিয়ে জুড়াতে চায় আমিও সেই মত অদৃশ্যময়ী মাতাজীকে বুকের মধ্যে রেখে সামনে প্রতিমূর্ত্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিশেহারা হয়ে গিয়ে আবার আত্মহারা হয়ে গেলাম।

সবাই কিন্তু চুপচাপ। আমার বড় ঈর্ষা বোধ হোল। এরা সবাই নিশ্চয়ই আমার চেয়ে আরও অনেক কাছে, মাতাজীর কাছে, পৌছে গেছে। তাই কথা নাই। আর আমার ও মাতাজীর মধ্যে কথার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। যেন ওপারে একজন আর এপারে আর একজন। তবু চুপ করে থাকতে পারলামনা। বল্লাম, "মাতাজী, তখন আপনি যে ক্রিয়ার কথা বলছিলেন, তাতো শেষ হতে পেল না। ক্রিয়া কি রকম করা চাই, আর একটু বলুন।"

বলতে ভুলে গিয়েছি সভায় বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী পুরুষ ও রমণী উপস্থিত থাকায় মাতাজীর অনুরক্ত কয়েজন ভক্ত বলেছিলেন, "হিন্দীতেই কথাবার্ত্তা হউক্।" সেই জন্য মাতাজী প্রায় সব সময়েই উত্তর হিন্দীতেই দিচ্ছিলেন। ভাঙ্গাচোরা ভাষাঠিক জোড়া লাগছে না এই রকম একটা অনুমান করে মাতাজী একবার বল্লেন, "কি করি বাবা, এ শরীরে টুটা ফুটা হিন্দী আসে যেমন পাখীরা উচ্চারণ করে।" সকলেই বলে উঠলেন, "না মাতাজী, আমাদের বেশ ভাল লাগছে।"

ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। শামিয়ানা জোড়া দিয়া অনেকখানি স্থান করা হয়েছিল। এক্ষণে লোকেরা পশ্চাতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলেন ও মাতাজীকে দর্শন করবার জন্য অনেকে পিছনে থেকে সাগ্রহে ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনেক কষ্টে মাতাজীর মুখখানি কতক দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন। সেই কারণই বোধ করি প্রস্তার উঠ্‌ল যে মাতাজী একটু উচ্চে একটা কৌচে বস্‌লে ভাল হয়। একখানি সোফা চারজন মিলে যথাক্রমে বয়ে আনলেন। মাতাজী চুপ করে দেখছিলেন। কিন্তু তাঁকে ব্যবস্থাটা জানাতেই তিনি এমন নীরবে "না" করে দিলেন যে সকল যুক্তি তর্ক পরাস্ত স্বীকার করল। মাতাজী সকলের সঙ্গে সমতলভূমিতে বসে রইলেন, তাঁকে একটুও বিচলিত করতে কেহই পারল না। অথচ কারও মনে কষ্টও হোল না। পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যেন মাতাজীর প্রকৃত স্বরূপ আরও বেশী করে দেখ্‌তে পেলেন। ও সেই জন্যই বোধ করি বলে উঠ্‌লেন, "না, মাতাজী, আপনি যেখানে বসে আছেন, ঐখানেই থাকুন, আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি।"

মাতাজী কিন্তু একটুখানিক উদ্বিগ্ন হয়ে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের জন্য যাহাতে বসবার স্থান হয় তাই তাঁহার কাছে যে সব মহিলারা বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে নিকটতম এক বৃদ্ধাকে হাত দিয়ে জাপটে ধরে বল্লেন, "মা, তুমি, তোমরা সবাই, মেয়ের কাছে, আরও কাছে, সরে এসে বসো না!" বৃদ্ধা, মাতাজীর আসনের খানিকটা অংশে পৌঁছে গেলেন ও মাতাজী সতরঞ্চির দিকে নেমে যাচ্ছিলেন। কেহ কেহ বলে উঠ্‌লেন, "মাতাজীর আসনে কিন্তু মাতাজীর বসা চাই।" বৃদ্ধা সম্ভ্রমে সে অনুযোগ স্বীকার করে নিলেন। মাতাজী বল্লেন, "বাবা, মেয়ের আবার মায়ের কাছে আলাদা হওয়া কি? উঁচু নীচু স্থান কি? সবাই এত

যখন কাছাকাছি মিলে মিশে থাকা তখন সেই ভাবটা বেশী করে মনে রাখ্‌লে ভাল হয় না কি?"

আমি কথাটাকে ফেরাবার জন্য বল্লাম, "মাতাজী, আপনি ক্রিয়ার কথা বলছিলেন। আর কি বল্‌বেন না?"

আবার মাতাজী আরম্ভ করলেন। যাহা বলছিলেন তাই আবার কতকটা পুনরাবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, মন্ত্র, জপ, তপ, পূজা, অধ্যয়ন, সবই ভাল। সবই দরকার। যার যতটা উপকারে লাগে। তবে দেখ, প্রথমে এ সব ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। ক্রমশঃ দেখা যায় সবই এক রকম হয়ে যায়। স্কুলে যখন ছেলে ভর্ত্তি হয়, কতগুলো বিষয় পড়ে। ক্রমশঃ বিষয়গুলো বেড়ে গিয়ে কমে যায়, আবার বদলেও যায়। পরে কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হয়, কেউ বা প্রফেসার হয়, কিন্তু আবার সেই একটা বিষয় ধরেই অন্য কত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এ বের মধ্যে নানা পথ হয়ে যায় যেমন নানা থেকে একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনই ধর্ম্ম সাধনার মধ্যেও নানা পথের উদয় হয়, আবার সব মিলে যায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, কোনটাই, বাবা, পৃথক নয়। ভক্তি না থাকলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না থাকলে কর্ম্ম করা যায় না। আবার কর্ম্ম জ্ঞানকে শুদ্ধতর করে, ভক্তিও তো সঙ্গ ছাড়ে না। কখন যে কোন্‌টা নজরে থাকে, আর কোন্‌টা থাকে না, সে কথা সাধক নিজেই ভুলে যা'ন। তবে এ নিয়ে তো গোল করা ঠিক নয়। ঠিক কি? তাই হয় বাবা, কোন পথ, কোন ক্রিয়াই ফেলবার নয়। যেটা তোমার অনুকূল মনে হয়, সেইটা ধরেই চল, বাকিগুলো কেউই প্রতিকূল হবেনা। তুমি কেন প্রতিকূল হবে বাবা? সব দিয়ে সেই সবকে, সব যিনি, তিনিই ত ধরে রয়েছেন। যদি ছাড়েন বলো, সেও ত তাঁর ধরাই। তাঁর কাছে ছাড়া আর ধরা, কি আছে বল দেখি?"

একটু চুপ থেকে আমি বল্লাম, "মাতাজী, আপনি স্কুলের উদাহরণ দিলেন। স্কুলে যখন যাই, বাবা নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দে'ন, মাষ্টার মশায় পথ বলে দে'ন। সাধনার পথেও কি তা'হলে গুরু না হলে চলবে না?" মাতাজী বল্লেন, "তা'ত সত্যি, বাবা, গুরু চাই বৈ কি। সামান্য লেখাপড়ার জন্য গুরু যখন দরকার হয়, ধর্ম্ম সাধনায় গুরু দরকার হবে না?"

আমি বল্লাম, "মাতাজী তা'ত বুঝলাম। তবে গুরু পাওয়া কি করে যাবে? পৃথিবীর স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তা গুরুর অন্বেষণ করে নেয়, আবার ভুলও করে। যাক্ সে কথা। ধর্ম্ম-জীবনেও কি ঐ একই পথ? শিষ্যকে কি গুরু-অন্বেষণ করতে হবে? না, গুরু যিনি তিনি শিষ্যকে খুঁজে নেবেন?"

কথাটা হয়ত আমার বলা উচিত ছিল না। কিন্তু আমি ত কোন বিশেষ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বলিনি। জানতে চেয়েছিলাম, সাধন জীবনের নিয়মটি কী? মাতাজীও রুষ্ট হলেন না। আনন্দময়ী মা যদি রুষ্ট হ'ন তা'হলে তাঁর নামের সার্থকতা কোথায়?

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, ঐ দুরকমই হয় অথবা এও বলা যায় যে দু'জনা দুজনকেই খোঁজেন। কারণ আসলে সেই একজনাই একজনকে পান কি না। পান না কি? তবে কথা হচ্ছে দু'জনের ভিতরেই সেই এক ইচ্ছাই কাজ করে, সেই একই ইচ্ছা সব ঘটাচ্ছে বাবা। তুমিই বল?

আমি নিজের অন্তরে খুঁজতে চেষ্টা করলাম। কথা ত অনেক কইলাম। মাতাজীর উত্তরগুলি প্রাণের উপর পরশ বুলিয়ে গেল। যেটুকু জ্ঞান পাওয়া গেল সেটুকু পৃথক করে নিবেদন করে আলগোচে জানাব,

এমন উপায় নাই। মাতাজীর উত্তরগুলি তাঁর জীবনের এত ঘনিষ্টভাগ বলে মনে হতে লাগ্‌ল যে তাঁকে ও তাঁর কথাগুলিকে অভিন্ন বলে মনে হতে লাগল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম , তিনি যা' উত্তর দে'ন, তার ভাষা এত সরল, ভাব এত সুস্পষ্ট, যে তা' শুনতে বা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর বলবার ভঙ্গিতে যেন সমস্ত উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রয়েছেন। সেই ভঙ্গিটুকু মর্ম্ম স্পর্শ করে বুঝিয়ে দেয় যা' কথায় অব্যক্ত থেকে যায়। তাঁর সব কথা শুনে মন সায় দিয়ে ওঠে যে বুঝেছি। কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বুঝেছ? তার উত্তরে নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নাই। যেমন পেট ভরেছে কি না, তার উত্তরে বলা যায় "হাঁ ভরেছে।" কিন্তু কি খেয়ে ভরেছে, তার আস্বাদ কেমন লাগল তা' যে খায় নাই তাহাকে বোঝান যায় না। আর যে খেয়েছে তাকে বোঝাবার দরকার হয় না।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নদীর ক্ষীণ কায়াটুকু ছায়াপথের ভিতর দিয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। পথ চলে গেছে। তার শেষ কোথায় তা' পথই বলে দিতে পারে। মাতাজী কি ক্লান্ত বোধ করেন না? শুনেছি সকাল থেকে লোকের ভিড় থাকে। সবাই কত কথা জিজ্ঞাসা করে। সত্যি, এবার আমার চুপ করা উচিত। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এত কাছে বসে চুপ করে থাকব কেমন করে? মনে মনে স্থির করলাম মাতাজীর কাছে আজ আমার বিদায় লওয়াই ভাল। দূর থেকেই একটা যেমন করে হউক্ প্রণাম জানালাম। মাতাজী বল্লেন, "ঠাণ্ডা লাগবে বাবা? এইবার যাবে বুঝি?"

আমি বল্লাম, "হাঁ মাতাজী, কাল আবার দেখা হবে।"

মাতাজী উত্তর দিলেন না। কান পেতে রইলাম। তিনি আদেশ দিলেন, "এইবার কীর্ত্তন হউক্।"

কীর্ত্তনের ব্যবস্থা বোধ করি পূর্ব্বে থেকেই ছিল। তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হতেই চলে আসা আমার ভাল লাগ্‌ল না। শামিয়ানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রইলাম, খানিকক্ষণ শুনতে লাগলাম। মাতাজীর আর যেন স্পর্শ পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। সাবাই গাইছেন "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।" আর মাতাজীর স্বরূপটি কোন উদ্দেশবিহীন অসীমের পারাবারে মগ্ন হয়ে পড়ছে তা' সেই স্তিমিত আলোকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমার অনুভূতির বাহিরে ছিল না। আমি বুঝলাম, মাতাজী ডুবে গেছেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে যেতে পারলাম না। কীর্ত্তনের কথাগুলো আমার শরীরকে যেন কাঁটার মত বিদ্ধ করতে লাগল। অযোধ্যা প্রদেশের পুণ্যভূমিতে রাজা রামের কীর্ত্তনের মধ্যে রাজরাজেশ্বরীকে ডুবতে দেখে আমি অন্ধকার পথে পা বাড়ালাম।

আকাশের চাঁদ আকাশে, নদীর জল নদীতে। আমার মন সুরের সঙ্গে ভেসে ভেসে একটি স্বরূপের অন্বেষণে উদাস হয়ে চলে গেল। ঘরে ফিরলাম বটে, কিন্তু মন আর ফিরল না।

(৩)

মাতাজীর দরবারে সকালবেলা

পরের দিন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) সাকাল বেলা। বেলা প্রায় দশটা হবে। আমার মাতা ঠাকুরাণীর প্রস্তুতির বিলম্ব হওয়ায় তাঁকে নিয়ে মাতাজীর কাছে পৌছাতে দেরী হয়ে গেল। মাতাজীর নিকট পৌঁছে দেখ্‌লাম, অনেকগুলি ভদ্রমহিলা তাঁকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। হাসিমুখে অভিবাদন করলেন। কি যেন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। আমি আমার অন্তরে

আবহাওয়ার মাপকাঠির স্পর্শ নিতে ব্যস্ত ছিলাম। মনে হোল মাতাজী যেন অন্তঃপুরে বসে আছেন। সে যে কোথাকার অন্তঃপুর তাই খুঁজতে লাগলাম। মহিলাদিগের মধ্যে বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী সব রকমই ছিলেন। মাতাজীকে বাঙলা কিংবা হিন্দীতে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তিনি হিন্দীতে কখনও বাঙলাতে উত্তর দিচ্ছিলেন। বাঙলায় বলে আবার হিন্দীতে তার পুনরুক্তি করছিলেন। সেই হেতু সকলেই বুঝতে পারছিলেন। আমার মত কয়েকটি পুরুষও যাঁরা এসে পড়েছিলেন পিছনে ছিলেন।

অন্তঃপুরীকাগণের চিন্তার একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করলাম। প্রায় সকলেই মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে চা'ন। মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে জন্ম হয় কি না ইত্যাদি। একজন বলিলেন, "মা, মৃত্যুর পরে মানুষ থাকে কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, থাকে বৈকি। এই যেমন গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ হয়। সেই রকমই মানুষ মরলে পরে বীজের মত জন্ম মৃত্যু এইভাবে চলতে থাকে।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মৃত্যুর পরেই কি জন্ম হয়? সময় লাগে না?

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, সময় লাগে, আবার লাগেও না। এই যেমন তোমরা এসেছো, আবার বাড়ী যাবে। পথে কোথাও দাঁড়িয়ে যেতে পারো, আবার সোজা চলেও যেতে পারো।"

একটি যুবক পিছন থেকে বল্লেন, "আত্মা ত একটাই। তবে এতজনের আলাদা অবস্থা হয় কেমন করে?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, আত্মা এক বটে। কিন্তু জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন

পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় ও সেই সকল বিশিষ্ট আধারের জলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতি হয় , যতক্ষণ না সেই নির্দ্দিষ্ট জল সমগ্র জলে মিশে যায়, কতকটা সেই মত। পরমেশ্বরকে পেলে পর জন্ম মৃত্যুর কথাই উঠে না। যতক্ষণ না বস্তুর জ্ঞান নিজ সত্তার মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ হয় ততক্ষণ আসা যাওয়া থাকেই।"

একটু থেমে বল্লেন, "আর সেই এক বস্তুর সঙ্গে মেলবার জন্যই ত এই আসা যাওয়া। সেটা হলে ত এসব প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। দেখ, স্বভাবের মধ্যেও তাই ত গতি। নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কূপের জল কিংবা বৃষ্টির জল সব একত্র হবার জন্যই চলেছে। সেই একের মধ্যে সব বিভিন্ন রূপ ধারণ করে রয়েছে। একের মধ্যে ভিন্নতা। এই ভিন্ন ভাবের মধ্যেই সব একের দিকে চলেছে। আবার একের মধ্যেই সব ভিন্ন হয়ে রয়েছে। আবার আমাদের যখন মনে হচ্ছে ভিন্ন তখন তারা অন্তরে একই আছে। আবার যখন তারা একই রয়েছে তখন ভিন্নতার ভাব ছাড়তে পারছে না। এই দুইটি ভাবই যে তাঁরই মধ্যে রয়েছে। একে ভিন্নতা ও ভিন্নতায় এক।"

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "তা'হলে কিসের দ্বারা মৃত্যুর প'রে জন্ম নির্দ্ধারিত হবে?"

মাতাজী বল্লেন, "কর্ম্মের দ্বারা। যে যেমন করেছে সেই ভাবই ত তার সঙ্গে ইচ্ছারূপে থাকে। এই জন্যই ত এ জীবনে যত পারবে ঈশ্বরের দিকে চেয়ে থাকবে। তাঁরই কথা ভাববে। তা'হলে পর সেই মত ইচ্ছা, সেইরূপ কর্ম্মের ফল সঙ্গে যাবে। তা'তে তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার অভিষ্ট দেবতার ইচ্ছা মতই, তোমার জন্ম হবে। হবে কি না? তা'ও তুমিই যখন ইচ্ছা করবে। তাই তোমার ইচ্ছা মতই কাজ হবে।

তবে সে জন্ম আরও তোমার পক্ষে ভাল হবে। কারণ তুমি নিজেই ত চাইবে যে তোমার ইচ্ছা দিয়ে নয় বরং তাঁর ইচ্ছা দিয়ে তোমার পরজন্ম স্থির হোক্। তাঁর ইচ্ছা আরও বেশী করে তোমার ইচ্ছায় ও তোমার ইচ্ছা বেশী করে তাঁর ইচ্ছায় পরিণত হলে তুমি এগুচ্ছ কি না? মূলতঃ তোমার ইচ্ছা ও তাঁর ইচ্ছা ত ভিন্ন নয়। ভিন্ন কি?"

মহিলাগণ চুপ করে শুনছিলেন। মাতাজী আবার বলতে লাগলেন, "মনে হয় বটে পৃথক। তাই ত অবিরাম এইরূপ ইচ্ছা করতে হয়— সেই একের মধ্যে ডুবে যাই। তখন জন্ম মৃত্যু থাকুক না থাকুক, এ প্রশ্নই আর অন্তরে থাকে না। আসলে এ প্রশ্ন ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলাদা আলাদা ভাব থাকে। এই ভাবটি কেটে যাবে না, অথচ মৃত্যুর পর জন্ম হবে না, এমনতর কি করে হবে?"

একজন প্রশ্ন করলেন, "তা'হলে পরমেশ্বরের সাথে মিশে গেলে পর আর ত জন্ম হয় না?"

মাতাজী বল্লেন, "সে প্রশ্ন তখন আর উঠে না। দেখ, তোমার জীবন তখন তোমার এই ক্ষুদ্র জীবন থাকে না। যা' দেখ্ছ, যা' দেখ্ছ না, যা' রয়েছে, যা' থাকবে, যা' ছিল, তোমার শিশুত্ব, তোমার বৃদ্ধত্ব, তোমার আগের, তোমার পরের যা' কিছু সব মিলে এক অখণ্ড জীবন তখন তোমার জীবন বলে বুঝতে পারবে। কাজেই কার জন্ম, কার মৃত্যু, এসব কিছুই তখন থাকবে না।"

একজন প্রশ্ন করলেন, "কি করে এই অবস্থায় পৌছাতে হয়?"

মাতাজী বল্লেন, "এই ত বল্লাম, অভ্যাস করে যাও। সব সময়েই, সকল অবস্থায় তাঁকে মনে করে চলতে হবে, যেন একটি শ্বাসও ব্যর্থ না যায়। তাঁর কথা বল্বে, তাঁর কথা চিন্তা করবে, তাঁর কাজ করবে, লক্ষ্য তাঁর দিকে থাকা চাই। কি করছ, কি ভাবছ, কি বল্ছ, তা'তে মন

থেকেও থাকবে না। অথচ না থেকেও থাকবে। কারণ তিনি যখন অন্তর জুড়ে থাকবেন তখন কোন দিকেই কোন ভয় বা চিন্তা নাই।"

একজন তরুণী বল্লেন, "মা, মনটাকে স্থির করতে পারি না। এ'র কি উপায় হবে?"

মাতাজী বল্লেন, "অস্থির মনই ত এ'র উপায় করে দে'বে। অস্থিরতা থেকেই ত স্থিরতা হবে। আবার স্থিরতা থেকে অস্থিরতা জন্মাবে। এ সবই সেই একেরই খেলা, যত বুঝবে তত মন আরও স্থির হবে। আবার অস্থিরতাও বাড়বে। তবে সুবিধা হবে এই যে এখন তুমি যেমন চাইবে সেই রকমটি হবে না, ক্রমশঃ তিনি যেমন চাইবেন সেই মত হবে। তারপর যা' হবে তা'ত বলা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা মূলতঃ এক যে, তাই এক তিনি তোমার অন্তরে উদয় হবেন। কোথায় বা থাকবে তুমি। তোমার থাকা না থাকা তোমার কাছে সমান হয়ে যাবে না কি? অথবা যখন তুমি থাকবে মনে হবে, না তো, তিনিই আছেন। আবার যখন তুমি থাকবে না, ভয় হবে না, মনে হবে, তিনি ত রয়েছেন। অথবা এমনও হতে পারে, যখন তিনি আছেন তখন তুমি সত্তার উপলব্ধিতে ডুবে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যাবে। আবার যখন আশঙ্কা হবে যে তিনি নাই, তখনই বুঝতে পারবে যে তুমিও নেই ও তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে অন্তরে ঠিক ধরে নিতে পারবে যে তিনি তুমি ও তুমি তিনি হয়ে আছ। এখন যেমন তোমার উপর তাঁর অস্তিত্ব, তখন সেই মত তোমার অস্তিত্ব তাঁর জানার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। ও সেই পরম দেবতা বিরাজ করবেন তোমার সকল সত্তা জুড়ে।"

মাতাজীর কথাগুলি যেমন যতটুকু বুঝেছিলাম ও মনে রাখতে পেরেছি তাহাই লিপিবদ্ধ করলাম। তাঁর উত্তরগুলি সকলের জন্য একটি

উক্তিতে পর্য্যবসিত করতে হলে অনেক প্রকার বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ একসঙ্গে করতে হয়। তা' শুধু তাঁর অলৌকিক শক্তিতেই সম্ভব।

একজন বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করলে মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতি হয় কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তা' হয়। শীঘ্র তার জন্ম হয়ে যায়।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী , মৃত্যুর পরই যখন মানুষ কোথাও চলে যায়, সেই ত তার বলতে গেলে একটা জন্ম হয়ে গেল। তা'হলে আবার জন্মের কথা কেন?"

মাতাজী বল্লেন, "তার অবস্থা আরও অনুকুল হয় বলে আর একটা ভিন্ন জন্মের কথা বলা হোল।"

একজন পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোক বলেছিলেন, "এই সব শ্রাদ্ধাদিতে যদি কাহারও বিশ্বাস না থাকে তা হলেও কি তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করা উচিত?"

মাতাজী বলেছিলেন, "বাবা, অবিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে লাভ কি?"

বৃদ্ধ লোকটি বলেছিলেন, "শাস্ত্রাদি ত কালের ধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রাদি ফলবে না কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তা'ও ঠিক। আবার এও ত বলা যায় যে সমস্ত কাল ত তাঁকে নিয়েই। আর তিনিই ত সব শাস্ত্রের পশ্চাতে? কাজেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে কি আসে যায়? যদি ঠিক মত, শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ হয়, সেইটাই ভাল নয় কি? আর যে মানুষ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস করেনা তার সংস্কারও তো সেই শাস্ত্রের কার্য্য অনুসারেই তৈরী হয়েছে?"

তারপর বল্লেন, "সংস্কারের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে। সেই সংস্কারের দ্বার দিয়েই ত সে মানুষটি শাস্ত্রের বোঝাপড়া করবে। সব চেয়ে ভাল

কথা হচ্ছে যে দিকে যে ভাবে বিশ্বাস আছে, সেই দিকে সেই ভাবে ক্রিয়া করবে। কোনটাতে অবিশ্বাস তা' খোঁজ করবার দরকার কি?"

একটু থেমে বল্লেন, "নিয়ে তো তিনিই যাচ্ছেন বাবা। আমার অবিশ্বাস দিয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারার কেন? যেখানে বিশ্বাস আছে, সেইখান থেকেই এগিয়ে চল না বাবা। সব সংস্কারের পারে সকল শাস্ত্র এক হয়ে রয়েছে। তোমার বিশ্বাসের আগুন তোমাকে দেখিয়ে দেবে, এখানে আগুন জ্বলছে, ওখানে আগুন জ্বলছে, তোমার বুকের মধ্যেও আগুন জ্বলছে: সবই ত আগুন। সবই ত সেই একই। সেই একের শরণাপন্ন হও।"

"যুক্তি কর, কিন্তু অহঙ্কারের জন্য নয়। শুধু তর্ক করেও লাভ নাই। সত্যকে ধরা অল্প কথা নহে। আবার অল্পও বটে, যখন সত্য ধরা দে'ন। বিশ্বাসের পথে সরলভাবে এগিয়ে যাও। মিছে সময় নষ্ট করে কাজ কি? তোমার জ্ঞান মত, তোমার বিশ্বাস মত, তুমি এগিয়ে যাও। অবিশ্বাসের কথা কিংবা অপরের বিশ্বাসের কথা নিয়ে তোমার কি হবে বাবা? তখন জ্ঞান ও বাড়তে থাকবে। তোমারও পরিবর্ত্তন হতে থাকবে। সে যে কত বড় পরিবর্ত্তন তা কথায় বুঝান যায় না।"

একটি মহিলা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মানুষ মরে যাবার পরে মানুষ ছাড়া আর কোনরূপে তার জন্ম হওয়া কি সম্ভব?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, সম্ভব। যেমন মন থাকবে, সেই মত হবে। পশু হতে পারে, গাছ হতে পারে। পাথরও হতে পারে।"

আমি বল্লাম, "আমি ত তাহলে বৃক্ষ হতে চাইব। বেশ কোন নড়া চড়া নেই। ফুল ফল পাতা যার যা' ইচ্ছে নিয়ে যাবে। আমার সেই ভাল হবে।"

একজন স্বামিজী দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তিনি বল্লেন, "তার চেয়ে ত ভাল পাথর হওয়া।"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "হাঁ, তা'হলে ভোগ পাবে, শিব বলে লোক পূজা করতে পারে।"

সকলেই হাসতে লাগলেন।

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "মাতাজী, মনের অবস্থা কি খাওয়ার উপর নির্ভর করে? খাওয়ার কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক?"

মাতাজী বল্লেন, "সে ত তোমার মনই বলে দেবে। কি খেলে তুমি ভাল থাকো তুমি নিজেই বিচার করতে করতে অগ্রসর হবে। এই বিচার তুমি ছাড়বে না।

তারপর এক নিঃশ্বাসে বোধ করি তাহার সাহায্যের জন্য তাহার ব্যক্তিগত অবস্থা বুঝিয়া তাহার কল্যাণের জন্য বল্লেন, "মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, লসুন ইত্যাদি ভাল জিনিস নয়। তোমার তাই মনে হয় না কি? তবে যদি না খেয়ে থাকতে না পারো, তাহলে ধর, আজ খেলে, কাল আর খেলে না, আবার পরসু না হয় খেলে। এই রকম করে একবার খেয়ে আর একবার খেতে দেরী লাগাবে। ক্রমশঃ আরও দেরী। অভ্যাস তোমায় সাহায্য করবে। আর খেতে ইচ্ছা কমে যেতে থাকবে। তোমার শরীরও চাইবে না। তা'তে উপকার হবে।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী, খাওয়াটা অনেক সময়ে আমাদের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বাড়ীতে মায়েদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তখন উপায় কি। কার ইচ্ছামত কাজ হবে?"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "দেখ, কার ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া তুমি চাও? তোমার না তোমার মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী?"

আমি বল্লাম, "সেই ত আমার সমস্যা। কখনও বা আমার নিজের

ইচ্ছা মত ঠিক করতে ইচ্ছা হয়। কখনও ব তাঁর ইচ্ছায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে। যদি একজনের ইচ্ছার উপর খাওয়ার ব্যবস্থা নির্ভর করত তা'হলে ত এই সঙ্কট উপস্থিত হোত না। আমি হয়ত মাছ খেতে চাই না, মা বল্লেন, খেতেই হবে।"

মাতাজী বল্লেন, "বেশ ত, তবে তাই চলুক না কেন। তা'তেও উপকার হবে। মন তৈরী হবে। তা'তেও কল্যাণ। ক্রমশঃ ভালই হবে।"

একটি মহিলা আবার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, "মা, মন চঞ্চল হলে কি করব?"

মাতাজী আবার পূর্ব্বের কথাই অন্যভাবে বল্লেন।

আমি বল্লাম, "মন যখন একবার এক দিকে, আর একবার অন্য দিকে যায়, তখন যদি গান গাওয়া যায় তা'হলে কি ভাল হয়? না, তার মধ্যেও মন্দ ফল আছে?"

মাতাজী বল্লেন, "না, সে ত খুবই ভাল। তাতে মন্দ ফল কিছু হবে না। যদি ঈশ্বরের দিকে মন থাকে, মন্দ হতেই পারে না। তাঁর দিকে মন থাকলে মন্দ আসতেই পারে না। আগেও নয়, পরেও নয়।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী, ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কতটুকুই বা জানি বা বুঝি। তারই মধ্যে যদি আলোচনা করা যায় তা হলে কি ভাল হয়?"

মাতাজী বল্লেন, "নিশ্চয়ই।"

আমি বল্লাম, "ধরুন, বিশ বৎসর পরে জানলাম যে আমি যাহা বলেছিলাম বা লিখেছিলাম তার মধ্যে ভুল রয়ে গেছে।"

মাতাজী বল্লেন, "তা'তে কিছু যায় আসে না। তুমি ত নিজে ভেবে চিন্তে কিছু করো নি। ঈশ্বরকে সামনে রেখে বলেছিলে, লিখেছিলে।

তার ফল ঈশ্বর ভালই করবেন। যদি কোন মন্দের আশঙ্কা তোমার হয়, ঈশ্বরের জগতের ভার তিনি নিজেই চালাচ্ছেন। আর সব ত কিছু পৃথক নয়। সবই ত তিনি।"

বেলা বেড়ে গেল। মাতাজীর অনুগত জন তাঁর সেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। এইখানেই সকালবেলার দরবার ভঙ্গ হোল।

(৪)

মাতাজীর দরবারে বৈকালবেলা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বৈকালবেলা। মাতাজী তাঁর ছোট তাঁবুতে বসে আছেন। সংলগ্ন শামিয়ানায় আর সবাই। তাঁর কাছে, খুব কাছে, মহিলারা। বৈকালের রৌদ্রটুকু তাঁর তাঁবুর মধ্যে এসে পড়েছে। গোমতী নদীর জলের দৃশ্যটি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে হলেও অনুভূতির বাহিরে নহে।

আমি বল্লাম, "মাতাজী, শুনলাম, এখানে আসবার কিছু দিন আগে আপনি কাশীতে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় কিছুদিন ছিলেন। এখন ত গোমতীর ধারে রয়েছেন। কোন্‌টা বেশী ভাল লাগে? গঙ্গা না গোমতী?"

মাতাজী চক্ষু মুদ্রিত করে একটুক্ষণের জন্য কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু তৎক্ষনাৎ ফিরে এসে হাসতে হাসতে গোমতীর পানে চেয়ে বল্লেন, "এও ভাল, সেও ভাল। বুঝলে বাবা? গোমতীও ভাল, গঙ্গাও ভাল।"

আমি বল্লাম, "তা' জিজ্ঞাসা করছি না মাতাজী, কোন্‌টা বেশী ভাল?"

মাতাজী বল্লেন, "এখানে এখন গোমতী বেশ ভাল লাগছে। কাশীতে গঙ্গাই ভাল লেগেছিল। তুমিই বল একই লোকের নাকটা ভাল কি

মুখটা ভাল, একথা উঠে কি করে? মানুষটাই যদি সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ সুন্দর হয়, তার নাকই দেখ বা মুখই দেখ সবই ত সেই পূর্ণ চিরসুন্দরকে হৃদয়ে এনে দেয়। দেয় না কি? সে যে কত সুন্দর তা'ত কথায় বলা যায় না, দেখে শেষ করা যায় না, তার সবটুকুই সুন্দর, অতি সুন্দর। তাই যখন যেখানে থাকা যায়, সেখানকার সবই সুন্দর লাগে। তারপর দেখে গঙ্গাই বল, আর গোমতীই বল, সবই ত অন্তরে একসঙ্গে রয়েছে। একটা আস্‌ছে, আর একটা চলে যাচ্ছে ও আর পাওয়া যাচ্ছে না, এমন ত আর নয়। তাঁর কথা ভাব দেখি? সেখানে ত সবই চিরবর্ত্তমান। গোমতীর তীরে বসে গঙ্গাকেও অনুভব করা যায়, আবার গঙ্গার ধারে বসে গোমতীকেও। আর বল বাবা, কেই বা দেখে? আর কা'কেই বা দেখে? দুই ত আর নয়। সবই ত এক, একদম একই।"

একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত বল্লেন, "মাতাজী, এখানে মহাবীরের মন্দির, চারধামের মন্দির আপনি এসব দেখেছেন কি?"

মাতাজী ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "কই তা'ত হয় নাই।"

একজন মুসলমান সাধক বল্লেন, "মাতাজী, এখানে কয়েকটা দেখবার মত মসজিদ ও ইমামবাড়া আছে। আপনি দেখতে যাবেন না?"

মাতাজী বল্লেন, "স্থান ত অনেক আছে। কোথাও ত যাইনি, বাবা। মোটরে করে ওরা সেদিন নিয়ে গিয়েছিল। কি সব কবর রাস্তায় পড়েছিল।"

মুসলমান সাধকটি বল্লেন, "আর একদিন আপনি এসব নিশ্চয়ই দেখ্‌বেন; আমার আপনাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়।"

সকলের সব কৌতূহলে অন্ত করে মাতাজী বুকে হাত রেখে একমুখ হেসে বল্লেন, "দেখ বাবা, মন্দির বল, মসজিদ বল, সব ত এখানে

সঙ্গে রয়েছে। সকল দেবতার যিনি তাঁর ত এইখানেই বাস। কেমন কি না?"

সকলে চুপ করলেন। আমি কথাটিকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "মাতাজী, শুনলাম, কাশী থেকে এখানে আসবার পূর্ব্বে আপনি মৈনপুরী গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কি দেখলেন?"

মাতাজী খুসী হয়ে বল্লেন, "শুনবে বাবা? সেখানে গিয়ে জানলাম, কত মাইল দূরে যেন এক গ্রামের মন্দিরে, একটি মেয়ে মৌনী হয়ে আজ নবছর ধরে অবিরাম নাম জপ করছে। কারও সঙ্গে কথা কয় না। দেখতে যাওয়া হয়েছিল। গিয়ে দেখা গেল, মন্দিরের সংলগ্ন একটা ঘর কয়েকজন মিলে নির্ম্মান করে দিয়েছে। মেয়েটি আগে মন্দিরের কাছেই গাছতলায় বসে নাম জপ করত। ঝড়ে, জলে, সব সময়েই একই ভাবে বসে থাকত। সেই জন্য, একটা পৃথক কামরা তারই জন্য নির্ম্মান করে দেওয়া হয়েছিল। সাধিকাটিকে এনে সেখানে স্থাপন করা হোল। কিন্তু সে আবার মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত। তারপর তাকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে হোত। সেই জন্য নির্ম্মাণকর্ত্তারা সেই ঘরের ভিতর দিয়ে ছাদে যাবার সিঁড়ি করে দিল। যা'তে ছাদে গিয়ে মাথায় হাওয়া লাগতে পারে। আবার ইচ্ছামত নীচে এসে ঘরে বসতে পারে। কি চমৎকার ভাবটি দেখা গেল। শুধু ইসারা করে, হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে জানায় যে আরও তিন বছর তাকে বসে থাকতে হবে। তার ন'বছর হয়ে গেছে; তিন বছর বাকি। কারও সঙ্গে কোন কথা কয় না। একেবারে মৌন থাকে।"

আমার মনে হলো, মাতাজী দেবতাকে খুঁজতে পৃথিবীময় ঘোরার কথা না বলে, বিশ্বের কোথায় কোন্ অজানা সাধিকা নীরবে নিভৃতে

ঈশ্বরের উপাসনায় মগ্ন আছেন তাঁর কথা বেশী করে বল্লেন কেন। তবে কি লোকে বুঝবে যে ভগবানের চেয়ে ভক্তই তাঁর বেশী প্রিয়পাত্র? তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাধকদের এই কথাই জানাতে চাইলেন কি যে প্রকৃত ভক্তকে দেখলে ভগবান্‌কে দেখা হয়, কারণ ভক্ত ও ভগবান্ যে অভিন্ন?

তাঁর নিকটে কয়েকটি মহিলা বসেছিলেন তাঁদের বল্লেন, "ঐ রকম ধ্যান ধরে বসে থাকতে পারো? যতদিন পারো,যতক্ষণ পারো। যদি সারাক্ষণ না পারো, নিয়ম বেঁধে নে'বে। আচ্ছা আজ হলো না, কাল সমস্ত দিন বসব। এই পনেরো দিন বিশেষ করে ঈশ্বর চিন্তা করব। এই দু'টো মাস কোন দিকে তাকাব না। তবে ত চঞ্চল মন, আরও চঞ্চল হয়ে তাঁর দিকে ঠিক যেতে পারবে। দেখ, চঞ্চল মনকে স্থির করতে পারছ না বলছিলে একটু আগে, এই ভাবেই স্থির করবার উপায় হয়।"

একজন আফিসের বড় কেরানী বসে ছিলেন আমরা তাঁকে জানি। মাতাজী কেমন করে জানবেন? তিনি বল্লেন, "মা, কথাটা বোঝা গেল না। চঞ্চল মনকে আরও চঞ্চল করার কথা কি বল্‌ছেন?"

মাতাজী পরিষ্কার করে বল্লেন, "দেখ বাবা, এই চাকরী পাওয়ার জন্য মন চঞ্চল হয় কি না? চঞ্চল হলে কি কর? আরও চঞ্চল কর কি না? চাকরীর অন্বেষণ কর, দরখাস্ত কর, দেখাশুনা কর, তারপর অনেক কষ্টের পর, চাকরী হবার থাকলে হয়েও যায়। হয়ে যায় না কি? সেই রকম সেই পরমাত্মার জন্য চঞ্চলতা হলে মনকে স্থির করতে যাবে কেন? মনকে আরও চঞ্চল করে দেবে। যত বেশী চঞ্চল হবে ততই তোমার আশা পূরণের আশা হবে। হবে না কি?

আমার নিকটেই কয়েক জন হিন্দুস্থানী বর্ষীয়সী মহিলা বসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনের প্রশ্ন তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করছিলেন না;

আমাকে আভাস দিলেন ও জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন।

আমি বল্লাম' "মাতাজী, আপনার কাছ থেকে জানবার জন্য আমার উপস্থিত বোনেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন, যদি আপনার কৃপা হয়, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা মনে রেখে ভারতবর্ষের মেয়েদের কিরূপ ভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনি একটু খানিক বলবেন কি?"

আমি বাঙলাতে প্রশ্ন করিলেও মাতাজী যেমন সকল কথা হিন্দীতে বলিতেছিলেন সেই মত বলিতে লাগিলেন যাহাতে সকলে ঠিক মত বুঝিতে পারে।

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, এ'টা কলিকাল বলে সব দিক থেকেই কষ্ট বেড়ে গেছে। মেয়েদের কষ্টও কিছু কম নয়। তবে যত কষ্টই হউক্ ভারতবর্ষের মেয়েরা তাঁদের আদর্শ ধরে থাকতে চায়। পতিরূপে সেই পরমগুরুর সেবা, বালগোপালদের সেবা, অতিথি অভ্যাগতদের পূজন, আত্মীয় স্বজনের যত্ন, মেয়েরা প্রাণপণে করে থাকে। আর এই সব কি রকম করে করলে আরও বেশী কল্যাণ হয় জান?

মাতাজী দৃষ্টিকে একটুখানিক সঙ্কুচিত করে একটুখানিক সলজ্জভাবে বল্লেন, "এই শরীরেও কতকটা এইভাবে জীবন কেটেছে ত। সে সময়ে, খুব সাবধানে, পরিষ্কার ভাবে, রান্না করতে করতে ভাবতাম, 'দেবতার জন্য ভোগ চড়াব; জলের ঘটিতে যেন পা লেগে না যায়।' খুব পবিত্রভাবে ব্যবস্থা করে সবাইকে খেতে দিলে মন কতই খুসী হয়। দেবতাকে খাওয়াচ্ছি, যা' কাজ করছি, দেবতার জন্য করছি। সব কাজের মধ্যে তাঁর চিন্তন, তাঁর ধ্যান, তাঁর পূজন, চলতে থাকবে। যখন যেটা

সুবিধা হবে চলতে থাকবে। তবে সব সময়ে পরম দেবতাকে সঙ্গে রাখা। তাঁর সঙ্গে একেবারে মাখামাখি ভাবে থাকা।"

"কিন্তু এটাও ঠিক, পতিকে দেবতা বলে মানা যেমন দরকার, তেমনই পুরুষও যেন পত্নীকে গৃহলক্ষ্মীর মত দেখেন। যিনি বেশী শক্ত হবেন তাঁকে ততই বেশী করে ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি অনুকুল মুহূর্ত্ত যেন বয়ে না যায়। একজনের চেষ্টায় আর একজনের কাজ হবে। এইভাবে দুজনে দুজনকে সাহায্য করে গেলে দুজনেই ভগবানের দিকে এগুতে থাকবে। দেখ, আর একটা কথা। শুদ্ধতা বেশী করে অর্জ্জন করতে হবে। এই জন্য সংযম দরকার। একেবারে স্থির করে বসবে যে এ বছরটা সংযম পালন করবে। নয়ত এই কয়টা মাস। তা'ও যদি না পারো এই কয়টা সপ্তাহ অথবা এই কয়টা দিন। ক্রমশঃ সময় বাড়াবে। কিন্তু সঙ্কল্প করে করবে। সংযমের ব্রত উদ্‌যাপন করবে। যত অভ্যাস করবে ততই উভয়ের কল্যাণ হবে। পরমেশ্বরের কাছে যাবার জন্য সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারলে তবেই ত আনন্দ? কেমন কি না? দেখ্‌বে, পরমেশ্বর সাহায্য করবেন। তিনিই ত করেন, তিনিই ত করান। সব শক্তি তাঁরই। তাঁকে ধরে থাকলেই সব পাবে। পতি আরও সুন্দর হবে। স্ত্রীকেও আরও ভাল লাগবে।"

আমি সবাইকে শুনিয়ে হিন্দীতে বল্লাম, "মাতাজী, যেখানে পতি পত্নীর মধ্যে প্রেম আছে সেখানে ত এসবই সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান কাল ত মেয়েদের বিবাহ বাপ মা নিজেদের পছন্দ মত দেন। সেখানে গোড়াতেই কিছু প্রেম সব সময়ে থাকে না। আবার পরেও অনেক সময়ে মনান্তর হয়। এ সবের জন্য কি প্রয়োজন? গার্হস্থ জীবনের উন্নতি আমাদের দেশে কি করলে সম্ভব হবে? এটা যদি আপনি ব'লেন তা'হলে মেয়েদের অনেক কল্যাণ হয়।"

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, কালের দোষ সব দিক্ থেকে এসে পড়লেও কালকে দোষ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এই কলিকালের মধ্যেই ত আবার সত্যযুগও আছে? বল ত, কাল কা'কে বলে? আজকের মধ্যে গত কাল নেই? আগামী কালও নাই কি? আজকের দিনে শিশুকালের সব নেই কি? আবার বৃদ্ধ বয়সে যা আসবে তা'ও ত রয়েছে? দৃষ্টির দ্বারাই আমরা কালকে বেঁধে নিই। এই তাঁবুতে বসে কেউ বা এইটুকু মাত্র দেখ্‌ছো। কেউ বা কলিকাতা, বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরে আসছে। সময়ই বল, স্থানই বল, সবই ত মানুষের মনগড়া সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। মনটাকে বড় করলেই সময়ের সীমাও বেড়ে যায়। স্কুলে গিয়ে ছেলেরা লেখাপড়া শেখে কেন? এখনকার যুগে সেই প্রাচীন যুগের সব কিছু স্মরণ করতে শিখে, আবার অনাগত কালের ছবিও তাদের মনে রেখাপাত করে না কি? এ তো গেল স্মরণের কথা। এছাড়া সত্য ভাবে, নিবিড় ভাবে, সমস্ত কালকে অনুভূতির দ্বারা পাওয়া যায়। এম্নি করে কলি যুগেই সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা, সবই ত এক সঙ্গে আছে। আবার এই সমস্ত কালের উপর সেই অখণ্ড মণ্ডলাকার পরমেশ্বর তিনিই ত নিজকে প্রকাশ করছেন। তিনিই ত ধরা দিচ্ছেন। দিচ্ছেন না কি?"

মাতাজী বল্‌তে লাগলেন, "কালকে যেমন দৃষ্টি দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে, সেইমত নিজকেও শুদ্ধ করবার কথাও মনে রাখা দরকার।"

একটু চিন্তার সুরে আবার বল্লেন, "দেখ, প্রাচীন কালে চতুরাশ্রম ছিল,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকটি আশ্রম সাধনার স্তর ছিল। অবশ্য কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে গিয়ে আর কোন আশ্রমে ঢুকতো না, এমনও ছিল। সবাই ঠিক।

চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে যাদের মন লেগে গেল তারা আবার অন্য আশ্রমে ঘুরবে কেন? তবে এ'টা মনে রেখো, যারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গৃহস্থে ও গৃহস্থ আশ্রমের পরে বানপ্রস্থে আসতো তাদের জীবনেও মূলে সেই ব্রহ্মচর্য্য ছিল। প্রথম আশ্রমের উপর ভিত্তি করেই ত সমস্ত জীবন। তাই ব্রহ্মচর্য্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি খুব বেশী করে থাকত। এটাকেই যদি সকল নরনারী অভ্যাসে রাখবার জন্য চেষ্টা করে তা'হলে কালও অনুকূল হবে। কাল বিগড়েছে, বেশতো তাকেও অনুকূল করে লও। ব্রহ্মচর্য্য পালনে মন দাও। নিজের দুর্ব্বলতাগুলো খুঁজে, এটা করব না, ওটা করব না, এরকম চেষ্টা যেন কোরো না। সব সময়ে মনে রাখ্‌বে, "এইটা করব", আর "এইটা করলে ভাল হয়।" মনকে বোঝাবে, রাজী করাবে। ভাল বৃত্তিগুলো সাধন করবে। মন্দগুলো আপনই সরে যাবে। যদি জবরদস্তি করে মন্দগুলোকে তাড়াতে চেষ্টা কর তা'হলে অগ্রসর হওয়া শক্ত হবে। ভাল হবে, ভাল করবে। ভালোর দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে ব্রহ্মচার্য্য আরও পাকা হবে। রাগ, হিংসা, লোভ কিছু আর থাকবেনা। রাগ হলে, লোভ হলে, কোন মন্দভাব এলেই, বুকের মধ্যে যিনি রয়েছেন তাঁর কাছে তৎক্ষণাৎ আত্মনিবেদন করে জানাবে, "রক্ষা কর, তুমি রক্ষা কর।" এমন অবস্থায় সব সময়েই ভাববে, আর একজনের কেন বিগড়াই? বিগড়ানোর কাজে যদি সহায়তা না কর তা'হলে তোমার অবস্থা সাধনার অনুকূল হবে। হবে না কি?"

"চল, আর একটু এগিয়ে যাই। এইভাবে চলতে চলতে, তখন জীবনের পরম দেবতাকে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরবে। সর্ব্বদা মনে করবে তিনিও তোমাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। তিনি তোমাকে ধরেন, তুমি তাঁকে ধরো। তিনি তুমি ধরতে ধরতে এক হয়ে যাও। এক

ভাব মনে রাখবে। দুই ভাব হলেই ত আসা যাওয়া। আবার, জন্মমৃত্যু চক্রের মত ঘুরবে। একভাব রাখবে। আত্মনিবেদন করে আপনাকে পাবে।"

আবার সঙ্কোচের সঙ্গে মাতাজী বল্লেন, "এই শরীরের জীবন যখন গার্হস্থ জীবন ছেড়ে গেল, কেউ কেউ মনে করল পাগল হয়ে গেল বুঝি? নিশ্চয়ই কোন রোগ হয়েছে।"

মাতাজী মুখ নত করে বলতে লাগলেন,"আমাকে যে ধরে নিয়ে যেতে এল, সে নিজেই শেষে মাথা গোল করে ফিরে গেল। যাক্ সে সব কথা। তবে এ'টা তোমাদের জীবনে মনে রাখ্‌তে হবে, পরমেশ্বর যখন সহায় রয়েছেন, সব বাধা বিঘ্ন কেটে যাবে। এ বিশ্বাস ত রাখতেই হবে। যে তাঁকে একবার পেয়েছে তার ত একথা জানা আছে। আর যে পায়নি বলে মনে করে, তারও পেতে ইচ্ছা করে না কি? এত বড় আশ্রয় কি আর আছে? এই ত আশ্রয়, সর্ব্বকালের, সকল মানবের, সব পরিবর্ত্তনের মধ্যে। জীবনের মধ্যে এই ভাবটি আপনি ফুটে উঠ্‌বে বলেই ত মানুষ নিরন্তর অপেক্ষা করে।"

মহিলাদের দিকে চেয়ে মাতাজী বল্লেন, "মাঈলোক! দিয়া জ্বালিয়ে রাখো, দিনরাত জ্বলুক, সারাক্ষণ জ্বলুক। ভগবানের কৃপা হবেই। তাঁর কৃপার উপর ত সকলের জীবন, ইহলোক, পরলোক, নির্ভর করছে।"

অনেকক্ষণ সকল চুপ করে রইলেন। পরে আমি বল্লাম, "মাতাজী, অভিমান বড় শত্রু। অভিমানকে কি করে বশে আনতে হয়?"

মাতাজী বল্লেন, "সে আপনা হতেই পালায়। আগেই ত বলেছি বাবা, কাউকে তাড়াতে যাবে না। গ্রহণ করবে, গ্রহণের দিকে সব সময়

দৃষ্টি রাখ্‌বে। ত্যাগের দিকে নয়। যখন যে অবস্থা হবে, যে মানুষ আসবে, যে বিপদ সামনে পড়বে, মনে রাখবে, তিনিই আসছেন। গ্রহণ করবে। ত্যাগের কথা মনে আনবে না। আর যা' ত্যাগের বস্তু তা' আপনা হতেই সহজে ত্যাগ হয়ে যাবে। তোমাকে ত্যাগ করতে হবে না। আর ত্যাগ কা'কে করবে, বাবা? কোন কিছুকে "ত্যাগ করছি, ত্যাগ করছি" ভাবলে পর, আরও বেশী করে অন্তরের মধ্যে গ্রহন করা হবে না কি? কাকে ত্যাগ করবে, বাবা? সবই ত তিনি। যজ্ঞ কর্ত্তা তিনি, আহুতি তিনি, দিচ্ছেন পাচ্ছেন সবই ত তিনি।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী, প্রেমের আদর্শের দিক্ থেকে হরগৌরী ভাব সাধনার বেশী অনুকূল না রাধাকৃষ্ণ ভাব?"

মাতাজী বল্লেন, "বাবা, ওসবই এক। যার যেটা ভাল লাগে তার সেই পথেই যাওয়া ভাল। নিজের মনই বলে দেবে, কোন্‌টা ভাল। তারপর সেই দিকে চলা। চলার ত, বাবা, শেষ নাই। তিনি অনন্ত। অনন্ত দিয়ে অনন্তকে অনন্ত কাল পাওয়া। এই প্রবাহের নামই ত জীবন। এ'র শেষ আছে কি? সব আদর্শ যে সেই একেতেই আছে তা' যত এগুবে বুঝতে থাকবে। মত নিয়ে কিংবা মতের বিবাদ নিয়ে যদি পড়ে থাকো তা'হলে মতকে পাবে, বিবাদকে সাথী করা হবে, তাঁকে সঙ্গী করা হবে কি? তবে এ'টা সত্যি যে মতগুলো তাঁকেই অবলম্বন করে রয়েছে। এই মতগুলো অন্তরের মধ্যে সরে সরে যায়। বুঝলে না? যেমন ধর, কলিকাতা যাবে, রেলের টাইম টেব্‌ল দেখ্‌লে। টাইম টেব্‌ল দেখ্‌লেই কিছু কলিকাতা যাওয়া হোল না। হোল কি?" বলে একমুখ হাসলেন।

মাতাজী বলতে লাগলেন, "টিকিট কিনে, রেলে বসে, চলতে হবে, পথে কত ষ্টেশন, একটার পর একটা আসবে, চলে যাবে। সবই ভাল লাগবে। কলিকাতায় পৌঁছানোর আনন্দ পেতে থাকবে না কি? বাবা,

উদাহরণ দিলাম। আবার এও সত্য যে যাবে কোথায়? তুমি ত কলিকাতাতেই রয়েছ। তাঁর মধ্যেই রয়েছ, থাকবে, এর অন্যথা হবে কি?"

"বাবা, মনে রেখো, সব তোমাতেই রয়েছে। যে প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নকর্ত্তা তিনি। যিনি উত্তর দেন তিনিও তিনি। যেখানে প্রশ্ন, সেখানেই উত্তর। সবই জানার মধ্যে। সকল জানা, বা যা' মনে করছ অজানা, সবই সেই পরমদেবতার মধ্যে।"

প্রসঙ্গ এইখানেই তখন শেষ হোল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। U.P. Government এর Adviser ডক্টর পান্নালাল আই, সি, এস্ ও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রচুর ফুলের তোড়া প্রভৃতি লইয়া সবান্ধবে শামিয়ানায় প্রবেশ করলেন। সকলের দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য তাঁদের দিকে ফিরল। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে হলেও লেখক পাছে নিজের দুর্ব্বলতাবশতঃ স্বীয় চিন্তার ধারা হারিয়ে ফেলেন সেই কারণে শঙ্কিত মনে সেখান থেকে উঠে, অন্ধকারের মধ্যে পথ করে, ঘর পানে ফিরলেন। মাতাজীর ছবিটি, তাঁর কথাবার্ত্তা, বুকের মধ্যে রাখবার প্রায়াস জগন্মাতা কি ব্যর্থ করবেন? সযত্নে, গোপনে, কোথায় এ সব রাখ্‌ব? ভাল কথা আমারই মনে শুধু রাখ্‌ব কি?

(৫)

মাতাজীর অদর্শনে

৭ই ফেব্রুয়ারী—মাতাজী আজ সকালে দেরাদুন এক্সপ্রেসে কাশী চলে গেছেন। শুনে অবধি আমার মনটা ভাল লাগছে না আজ সন্ধ্যাবেলা আর তাঁর দর্শন পাব না। তবু গেলাম বৈকালে, সেই স্থানটিতে,

যেখানে তিনি ছিলেন। তাঁর কয়েকজন ভক্ত এখনও সেখানে রয়েছেন। যাঁদের দেখা পেলাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সন্ন্যাসিনী শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী, যিনি বাঙলায় "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের রচনা করেছেন ও যাঁকে "দিদিজী" বলে আমিও আজ থেকে জানলাম। দিদিজীর নিকট শুনলাম, কাল অখণ্ড কীর্ত্তন সারাদিন ধরে হবে ও হয়ত সন্ধ্যার সময় মাতাজী ফিরে আসতেও পারেন। তিনি ত আমায় এইরূপ আশা দিলেন।

আবার কবে মাতাজীর সঙ্গে কথা কইতে পাব, কে জানে। তাই মনে মনে তাঁর সঙ্গে কথা কইছি। তাঁকে সেদিন সকলে মালা পরাবার জন্য আমার হাতে মালা এনে দিলেন। বড় কুণ্ঠা বোধ হোল। জীবনে ত কোথাও কখনও মালা পরাই নাই। তবু সকলের কথামত পরাবার জন্য গেলাম। কোন মতে মালার অর্ঘ্য তাঁর গলায় অর্পণ করলাম। কিন্তু তার পরেই মনে হোল আমার হাতের মালা তাঁর কাছ অবধি পৌঁছাল না। তিনি লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে রয়েছেন, আর আমি যেখানে পড়ে আছি, সেখানেই পড়ে আছি। মাতাজী আমার কাছ থেকে এত দূরে, এই অনুভূতি নিয়ে রিক্ত হস্তে শূন্য মনে নিজের স্থানে ফিরে এসেছিলাম।

আজ মাতাজীর স্থানে গিয়ে মনে হোল, এই ত তিনি আমার কাছেই রয়েছেন। আমার অন্তর জুড়ে, আমার দৃষ্টি জুড়ে, আমার দৃষ্টির অন্তরালে তিনিই রয়েছেন। আমার কাণে তাঁর বাণী ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। যখন তিনি সশরীরে আমার কাছে উপস্থিত থাকেন, তখন মনে হয়েছিল তিনি আমা হতে কত দূরে। আর আজ যখন অশরীরী হয়ে উপস্থিত রয়েছেন, তখন দেখছি তিনিই ত আমাময় হয়ে রয়েছেন। উপনিষদের

একটি বাণী মনে পড়ছে, তিনি দূরেও আছেন, আবার কাছেও রয়েছেন। তবে কি যখন সাকার ভাবে কাছে থাকেন, তখন তাঁর দূরত্ব উপলব্ধি করে মানুষ ব্যাকুল হয়? আর নিরাকার রূপে যখন দূরে বলে মনে হয়, তখন তিনি সারাটা অন্তর দখল করে মানুষকে তৃপ্তি দেবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন?

৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি সাড়ে একারোটা। আজ মাতাজীর স্থানে সারাদিন অখণ্ড কীর্ত্তন হয়ে গেল। আমি সকালে, বেলা দশটা নাগাদ, গিয়েছিলাম ও যতক্ষণ না শ্রীশ্রীমা সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছিলেন ও দেখা দিলেন ততক্ষণ ছিলাম। মাতাজীর গৃহস্থ ভক্তেরা সারাদিন প্রচুর মিষ্টান্ন, ফলাহার, প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তার উপর নদীর ধারের বাতাস, একটা চঞ্চল প্রতীক্ষার মত, সকলের অন্তর বাহির ছেয়েছিল।

সারাদিন "মা" নাম কীর্ত্তন হোল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখনও চক্ষে লেগে আছে। কাণের ভিতর দিয়া এখনও "মা" নাম অন্তর স্পর্শ করছে।

মা নাম বড় মিষ্ট লাগল। সারাদিন ঐ একটি নাম ধ্বনিত হোল। জীবের সেই প্রথম উচ্চারিত নাম। সকল জাতির মানুষ এই নাম ধরে পৃথিবীতে আসিয়া প্রথম হাঁক দেয়। তারপর আর সব সম্পর্ক ক্রমশঃ আসে। মা'কে শিশু চিনিয়া লয়। আর সব সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে তার জ্ঞান জন্মায় যখন সে মাতার নিকট হইতে জানিয়া লয়। মাকে চিনিতে কেহ শিখায় না। সেই "মা" নামটি হোল সকল ভাষায়, সকল ভাবের, সকল আবেগের ও সকল আকাঙ্খার মূল প্রস্রবণ। এই ধ্বনির সঙ্গে কী অভিনব পরিচয় মানুষের। এরই উপর ভিত্তি করিয়া মাতৃভাষার প্রাসাদ মানুষের জীবনে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত সংসার, সমস্ত সংস্কৃতি, সকল শাস্ত্র, সকল দেবতা ও সকল জীবের পরমগতি পর্য্যন্ত "মা"

নামের কাছে দণ্ডবৎ। মা আছেন বলেই জীবন আছে এবং মরণকে পর্য্যন্ত জীব ভয় করে না। মায়ের কোলে এসে সে নামে, মায়ের কোলে বিচরণ করে ও আবার ভবের খেলা হলে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ে, যতক্ষণ না নূতন ভোরে, আবার অভিনব সুরের আগমনীর গান মায়ের কোলে শিশুকে জাগায়। পিতৃহীন বালক মায়ের কৃপায় মানুষ হতে দেখা গেছে, কিন্তু মাতৃহীন শিশু এ পর্য্যন্ত জন্মাতে কেহ দেখেছ কি? যীশুর পিতৃত্ব সম্বন্ধে যত কিছু গল্প থাকুক, মাতা যে মেরী ছিলেন সে সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন। মায়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে আসিতে হয়, তাই মায়ের সমস্ত ছাপ সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মানুষ চিরদিন বহন করে।

"মা" নামের তুল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ আর নাই। যাঁহাকে "অক্ষররূপিণী বেদজননী" বলা হয় সে'ত এই মা নাম। বেদের হিসাবে অ,উ, ম, এই তিনটি অক্ষর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বোঝায় ও তিনটি মিলে "ওমা" অথবা "ওম্" উচ্চারণ করলে সমাধি বোঝায়। সমাধি শীর্ষক এই শব্দটি আর্য্যভূমির সকল শাস্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে। "ওম্" এই মন্ত্রের পর ব্রাহ্মণ তনয়ের জীবনে অবতরণ করে গায়ত্রী মন্ত্র। তা'তেও সেই মায়ের ছবি, প্রভাতে কুমারীরূপে, মধ্যাহ্ন যুবতীর বেশে ও সায়াহ্নে বৃদ্ধার স্বরূপে ব্রহ্মচারীর হৃদয়মনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। তা' ছাড়া "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা" মন্ত্রও শক্তি আরাধনার মূল কথা। বৈষ্ণব সাধনায়েও "মা" বাদ পড়েন নাই। যশোদা না কৃপা করলে যশোদার দুলালকে পাব কোথায়? খৃষ্টানগণ হয়ত বলবেন, মেরী মাতার কৃপা না হলে মেরী তনয়কে পাওয়া যায় কি? তা' ছাড়া খৃষ্টানগণ প্রার্থনার শেষে "আমেন্" অতি অবশ্য উচ্চারণ করবেন, তা' যে ভাষায় প্রার্থনা জানান না কেন। তবে কি প্রার্থনা মঞ্জুর করবার এই "মা" শব্দই একমাত্র অধিকারিণী? মুসলমানেরা

মুহম্মদের নামে "মুহম্ম" বারবার উচ্চারণ করেন। আর "আল্লার" নামে মা না থাকলেও তাঁর দুইটি বিশেষগুণে "রহমান্" ও "রহিম" শব্দে মায়ের নাম পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে। কে রক্ষা করিবে ও দয়া করিবে মা ছাড়া?

প্রত্যেক নরনারী "মা" বলে নিঃশ্বাস ফেলে। "মা" বলে ডাকলে জগতের সকল মেয়ের সাড়া পাওয়া যায়। মায়ের নাম করলে পুরুষের মন শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়। "মা" সবারই সব চেয়ে অমূল্য সম্পদ। আর সকলের স্নেহ ভাগ করে লওয়া যায়, কিন্তু মায়ের স্নেহের ভাগ হয় না। যত ভাগ করা যায় তত বেড়ে যায়। আর কেহ অপরাধের ক্ষমা করুক বা না করুক মা চিরদিন সব সহ্য করে সব অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার অপরাধ যত বেশী হউক্ না কেন, মায়ের দয়ার চেয়ে ত বেশী হবে না!

এমন মধুর নাম আর নাই। সেই নাম আজ সকল প্রদেশের নরনারী আমার কানে সারাদিন বর্ষণ করল। আমার শুষ্ক কণ্ঠেও সেই নাম ধ্বনিত হোল। সূর্য্য অস্ত গেল, ঐ নাম করতে করতে। প্রদীপ জ্বলল, মনের আগুনও দাউ, দাউ করে জ্বলতে লাগল, ঐ নামে। চোখের জলে আরও বেশী করে উত্তাপ বাড়তে লাগল। "মা" নামের তপস্যা অতীব মধুর, ঐ নামের গুণে যে সব তাপ সহন করা ও বহন করা যায়।

মাতাজী এই নামের ধ্বনির মধ্যে এসে পৌঁছিলেন। তাঁর আগমনে চারদিকে মাতামাতি আরও বেড়ে গেল। আমার ইচ্ছা হোল, মায়ের বেদীর কাছে, যাহা সারাদিন শূন্য ছিল, একটুখানিক জায়গা করে বসে যাই ও অপেক্ষ করি। কিন্তু ঠেলাঠেলি, চাপাচাপিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মাতাজী এসে বসলেন। আমি একটু দূরেই, দুইটা শ্রেণীর পিছন

অবধি পৌঁছে ছিলাম। পার্শ্বস্থিত কোন বাল্য বন্ধু কানে বল্লেন, "মাতাজী তোমাকে দেখে হাসছেন।" মাতাজী ত সব সন্তানদের দেখেই হাসবেন,আমার এমন কি গুণ আছে যে অকারণে আমাকে উপলক্ষ্য করে হাসবেন?

ঠেলাঠেলির মধ্যে আর বসে থাকতে ভাল লাগল না। কাল সকালে মাতাজীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাবার ইচ্ছা দিদিজীকে জানিয়ে ও ভাইজীর লিখিত বাঙলায় "মাতৃদর্শণ" শীর্ষক পুস্তকখানি রাত্রিটুকুর জন্য চাহিয়া লইয়া অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। বেরুবার পূর্ব্বেই কেহ কেহ জানালেন, "ভোগ লাগবে, প্রসাদ পাওয়া যাবে।" আমার মন গেয়ে উঠল, "সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই ল'ব।" তা'ও আজ রাত্রে নয়। কাল সকালে, বাসি করে, মায়ের প্রসাদ খাব। দেখি আমার জন্য মা কি রাখেন!

এর পর আর প্রতিদিনকার দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ করব না। কয়দিনই বা মাতাজীকে কাছে পাব। আবার হয়ত একদিন শীঘ্রই শুনতে পাব, তিনি চলে গেছেন অন্যত্র। এবার থেকে তাঁর কথাবার্ত্তা আরও বেশী করে ভাববো। আর যা' ভাববো তা' অসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করব। তার মধ্যে থাকবে মায়ের শক্তি ও আমার অক্ষমতা। আমার দুর্ব্বল অন্তরে যতটুকু তাঁর স্পর্শ আমি পাব তার চেয়ে বেশী আমি কেমন করে জানাব? তা'ও যদি মায়ের ইচ্ছা হয়। তাঁর ইচ্ছাই চলুক। তাঁর মুখর শিশুকে যতক্ষণ না তিনি নীরব করে দেবেন ততক্ষণ আর আমার উপায় কি?

দ্বিতীয় ভাগ

(স্মরন ও চিন্তন)

(১)

ধর্ম্মজীবনের দুইটি বিশেষত্ব

শ্রীশ্রীমার একটি কথা বিশেষ করে স্মরণ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ সম্বন্ধে অভাব অন্তরে জাগিয়ে রাখ্‌বে।" আমি কেন তাঁর কথা শুনে মনে মনে অনুভব করেছিলাম যে আমার অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগে? তিনি ত একদিন এই প্রসঙ্গেরই ইঙ্গিত করে হাসিমুখে উত্তর দিয়াছিলেন, "সেখানে কি ঠাণ্ডা গরম কিছু আছে বাবা?" তবু নিজের কথাটাই আবার কেন এসময়ে বেশী করে মনে আসছে? আমি ত কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না। যখন ঈশ্বরকে কাছে পাই না, তখন অনবরত সবই ঠাণ্ডা লাগে. এই সংসার সমস্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার দেহ মন যাহা কিছু সব বরফ বলে বোধ হয়। এ ত একদিন নয়, এ যে অনেক সময়ে অনুভব হয়। আবার যে নিমেষে তাঁর স্পর্শ আমার সত্তাকে স্পর্শ করে সেইটুকু সময় অনন্তকালের সংবাদ বহন করে এনে আমার হৃদয়মনে উত্তাপ সঞ্চার করে দেয়। আমি ত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তিনিই ত জীবন। যদি আমার ঠাণ্ডা না লাগবে, আমি উত্তাপ কেমন করে বোধ করব? কিংবা হয়ত

এমন হতে পারে যে ঠাণ্ডা ও গরম কিছুই নাই এবং আমার মনের ভাবই ঠাণ্ডা ও গরমের সৃষ্টি করছে। যত তাঁর জন্য ব্যাকুলতার অভাব হয়, ততই ঠাণ্ডা হয়ে যাই, যত ব্যাকুলতা বাড়ে ততই গরম হয়ে উঠি। কিন্তু ব্যাকুলতা যতই বাড়ে ততই ঠাণ্ডার ভাবও অনেক সময়ে দেখেছি বাড়তে থাকে! এমন কেন হয়? তবেকি ব্যাকুলতা যখন বেড়ে যায় সঙ্গে তার অভাববোধও বাড়তে থাকে? আসলে কি তা'হলে ব্যবধান তাঁতে ও আমাতে থাকতেই পারে না? আমরা উভয়ে মিলেমিশে কি একাকার হয়েই রয়েছি? শুধু কি এই একত্বের অনুভূতির জন্য আমার ঠাণ্ডা গরম বোধের সৃষ্টি? এই অনুভূতি যত বাড়ে ততই তাহারাও কি মিলে মিশে বাড়তে থাকে? কোথায় যাব? আমার ব্যাকুলতা, আমার ব্যাকুলতার অভাব দুইই আমাকে অতিষ্ট করে তুলছে!

কিন্তু শ্রীশ্রীমা আমাকে বলেছিলেন যে যতক্ষণ আমার মধ্যে ঠাণ্ডা ও গরমের ভেদ জ্ঞান আছে ততক্ষণ কি আমার খাঁটি অভাব জেগেছে? এই সংসারেই দেখ না, যখন কোন জিনিষের প্রকৃত অভাব হয়, যেমন খাওয়া বা ঘুমান, তখন আর অন্য কিছুতে মন যায় কি? ঈশ্বর সম্বন্ধেও যখন আমার সেইমত সত্যিকার অভাব বোধ হবে তখন সংসারের কোন তাগিদই আর কি এ দেহমনে পৌঁছাবে? সেই অবস্থাতে যতক্ষণ না পৌঁছাতে পারি ততক্ষণ নিজের অভাববোধ সম্বন্ধে গর্ব্ব করবার ত আমার কিছুই নাই। আর তখন কা'র কাছেই বা গর্ব্ব জানাব?

তবে এই প্রকার অভাববোধও ক্রমশঃ এসে পড়বে। তার জন্য শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "ক্রিয়া চাই। জীবনে ক্রিয়া ছাড়বে না।" এখন দেখছি ক্রিয়া আপনই চলবে। শ্রীশ্রীমা মানবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু আজ তিনি যে আমার কাছে নাই এই ভাবটি

আমার মনকে যখন এত বেশী করে ঘিরে রয়েছে তখন কে যেন কাণে কাণে বলে দিচ্ছে, মানুষের ধর্ম্ম যা' হবার তা' হোক্, আমার ধর্ম্মসাধন বোধ করি এই দুইটি কথায় লিপিবদ্ধ হতে পারে। "অভাববোধ"ও "ক্রিয়া"। জীবনটা যখন একটা প্রবাহ যাহা অনন্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন এটা বোঝা সহজ যে এই প্রবাহের একটা অভাব, সমুদ্রের দিকে যাবার অভাব, এক হয়ে যাবার অভাব, থাকবেই। আর সেই অভাব অমনই ক্রিয়াতে পরিণত হয় অর্থাৎ স্রোতের সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "যদি ক্রিয়া না কর, তাহলে শরীরমনে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হবে। দেখ না, জল যখন এক জায়গায় জমা হয়, তা'তে পোকা হয়, কি রকম দুর্গন্ধ জন্মায়, সেইরূপ নিজ সত্তার মধ্যেও হয়। যে ভাবে পারো ঈশ্বরের কাছে অগ্রসর হতে থাকো, পড়ো, লেখো, কথা কও, গান কর, তাঁরই সন্ধানে মনপ্রাণকে নিযুক্ত রাখো। বুদ্ধি বিচার খুলে যাবে। তিনি ত তোমার কাছেই রয়েছেন, তোমার অন্তরেই রয়েছেন, প্রকাশ, আরও বেশী- প্রকাশ হয়ে যাবেন।"

কে জানে কেন, আমার যীশুর দুইটি অনুশাসন মনে আসছে।"ঈশ্বরকে প্রেম কর" ও "প্রতিবেশীকে" অর্থাৎ সবাইকে "আত্মতুল্য প্রেম কর।" এই দুইটিও কি শ্রীশ্রীমা ধর্ম্মজীবনের দুইটি বিশেষত্ব যাহা জ্ঞাপন করেছিলেন সেই বার্ত্তাই আমার কাছে বহন করে আনছে না? ঈশ্বরকে প্রেম করব কেমন করে? সব সময়ে তাঁর অভাব অনুভব করে। সবাইকে আত্মতুল্য প্রেম করা সহজ নহে, যদি না ক্রিয়াকে সর্ব্বমুখী করে রাখি। দুই অবস্থাতেই প্রেম আছে। কারণ প্রেম না থাকলে কিছু হয় না। প্রেমই ত ঈশ্বর। "তিনি আছেন" বলেই ত অভাব, আর তাঁর অভাবের অনুভূতিই ত ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হয়।

যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহা হইলেও তাহার ধর্ম্ম এই অভাববোধ ও ক্রিয়ার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরেতে যাঁর বিশ্বাস নাই, এই অবিশ্বাসই তাঁর বিশ্বাসের মত হইয়া দাঁড়ায় এবং এই অবিশ্বাসরূপী বিশ্বাসের পরিপুষ্টিসাধন করাই তাঁর জীবনে ব্রত হয়ে অভাবে আরম্ভ হইয়া, ক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে। গাভী দুধ দেয় কেন? সে জানে তার বাচ্চার ক্ষুধা পায়। বাচ্চা যদি অকালে মারা যায় তা'হলেও মনের মধ্যে তার এই ভাবটি থাকে—"বাচ্চা আমার যে ভাবেই থাকুক তার ক্ষুধা লাগে। যতদিন না বাচ্চা আর কিছু খেতে শেখে বা খেতে পারবার মত বড় হয় ততদিন তাকে কে খেতে দেবে আমি ছাড়া?" বাচ্চা কাছে না থাকলেও গাভী-মাতার দুচোখ বেয়ে জল পড়ে, দুধও ঝরে। আমরাও যে আমাদের জগতের মাতাকে ছেড়ে রয়েছি, তাঁর কি আমাদের জন্য অভাববোধ হবে না? তাঁর দুধ অর্থাৎ স্নেহ কি আমাদের জন্য নিঃসরণ হবে না? আবার বাচ্চাও যেখানেই থাকুক, যা' খা'ক, মায়ের দুধটুকু অর্থাৎ স্নেহটুকু না পেলে তার পেট ভরবে না, তার মন ভরবে না। দুধের অভাবোধ থাকবে, আর এ'র জন্য যা' কষ্ট স্বীকার করতে হয় সে করবে। তবেই দাঁড়াচ্ছে এই যে গাভী ও বাচ্চা উভয়েরই যেমন "অভাববোধ" ও "ক্রিয়া"তে স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিন্যাস করা যায় অথবা তাদের শরীর মনের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা যায় সেইরূপ ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পরের প্রতি টানও এই দুইটি কথায় প্রকাশ পায়। উভয়ই ভক্তেরও ধর্ম্ম, আবার ভক্তের সম্পর্কে ভগবানেরও ধর্ম্ম। ভক্ত ও ভগবান্ ত পৃথক ন'ন, তাই তাঁদের ধর্ম্মও পৃথক হয় না। (তবে একথাও সত্য যে ভগবান্ ধর্ম্মাতীত কিন্তু সে হিসাবে সাধকও তখন কি ধর্ম্মাতীত নহেন?) আমি যখন অভাববোধ করি তখন তাঁর ক্রিয়া হয়। তাঁর যখন অভাববোধ হয়, তখন আমি

ক্রিয়া করি। তাঁর অভাববোধ না হলে ও সে অভাববোধ আমার অন্তরে না বেজে উঠ্‌লে আমি কি ক্রিয়া করতে পারি? আমি যখন ভক্তি করি তখন তিনি যোগী হয়ে আমার জন্যই বসে থাকেন, আমার ভক্তি গ্রহণ করবার জন্য। আবার আমার যখন যোগী হবার সাধ যায়, বনে বনে তাঁর উদ্দেশ্যে একলাটি কেঁদে বেড়াই, তিনি আমারই ভক্ত হয়ে আমার জন্য উতলা হ'ন। আবার আমি যখন জ্ঞান অর্জ্জন করি, সে শুধু তাঁর কর্ম্মের, তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব, তাঁর স্থিতিতত্ত্ব, তাঁর প্রলয়তত্ত্ব, এই সব। আবার আমি যখন কর্ম্ম করি তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারে তার ফল সঞ্চয় হয়। আমার ত কিছু ফল নিয়ে কারবার নয়, সব ফলই ত তাঁর। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়ার অনুশীলন, প্রেম ও যোগের ভিতরে অভাববোধের অভিব্যক্তি। সেই একম্ থেকে দুইটি কেন্দ্র হোল, আবার সেই দুইটি পথের সৃষ্টি হোল। এমনই চার থেকে ষোলোটি পথ দেখা দেবে এবং ক্রমে মানুষের গণিতশাস্ত্রে যা' কুলায় না ততপথ আবিষ্কৃত হতে থাকে নিরন্তর একটি জীবন ধরে। তিনি যে অনন্ত। অনন্তের পথও অনন্ত। যে খোঁজে সেও অনন্ত। যে পায় সেও অনন্ত। উভয়ে মিলেমিশে অনন্ত।

যাক্ ভগবান্ তাঁর ধর্ম্ম নিয়ে থাকুন। আমি আমার ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে যখন বারবার ফিরে আসছি, তখন ইহারই ভিতর আমাকে অনন্তের আস্বাদ ভগবান্ দিবেনই দিবেন। তিনি মহান্ বলে অনন্ত। আমি ক্ষুদ্র হয়েও অনন্ত। তিনি বৃক্ষ, আমি বীজ। আবার আমি বৃক্ষ হলে তিনি বীজ হয়ে থাকেন না কি? ঈশ্বর আমাকে পালন করেন, আবার আমিও তাঁকে পালন করি। পিতাপুত্রের এই ত চিরদিনই সম্বন্ধ চলে আসছে। আমি পিতা হ'ব, তিনি আমার পুত্র হবেন। তাইত আমাদের উভয়ের ধর্ম্ম এক। অভাববোধ ও ক্রিয়া।

আমি নিজের কথা আর একটু ভাবতে চাই। কোথা থেকে আরম্ভ করব? ক্রিয়া থেকে না অভাববোধ থেকে? যেদিন আমার নাড়ী কাটা হয়েছে, সেদিনকার প্রথম অনুভূতি হোল বিচ্ছেদ। তারপর ক্রন্দন। পূর্ব্বে ত ক্রন্দন করতে জানতাম না। তবে বিচ্ছেদের বেদনাই বেশী করে মানুষকে ক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। সে ক্রিয়া ক্রিয়াই নয় যাহাতে ঈশ্বরের অভাববোধ নাই। মনে রেখো মন, তোমার পড়াশুনা, চাকুরী, বন্ধু বান্ধবদের সহিত সম্পর্ক সবই পণ্ডুল, যদি সব সময়ে তারই ভিতর ব্রহ্মময়ী মায়ের জন্য অভাববোধ না থাকে।

মায়ের ধর্ম্ম মা পালন করুন। তাঁর ইচ্ছা হয় দূরে থাকুন, ইচ্ছা হয় কাছে রাখুন। আমার দায়িত্ব এইটুকু যে আমার অভাববোধ যেন থাকে। যদি না থাকে তা'তেও আমার ভয় নাই। আমার যদি না থাকে, তাঁর ত অভাববোধ থাকবে? মায়ের একটি ছেলে যদি হারিয়ে যায়, তাঁর কি এক ফোঁটাও চোখের জল পড়ে না? মায়ের সেই চক্ষের জল আমার তখন জীবনের পাথেয় হবে। যদি আমার চক্ষের জল শুকিয়ে যায়, যদি খেলায় ভুলে যাই, আবার সন্ধ্যা হবে, আবার মায়ের কোলের কথা মনে পড়বার সময় আসবে। মা কি তাঁর কোল শূন্য করে রাখ্‌তে পারবেন? বেশ তো, এমনই চলুক না কেন। যদি আমার অভাববোধ ও ক্রিয়া না থাকে, তাঁর অভাববোধ ও ক্রিয়া ত থাকবেই। আবার যদি তাঁর অভাববোধ ও ক্রিয়াও না থাকে অর্থাৎ মায়ের ও আমার কাহারও যদি দু'টার মধ্যে কোন কিছুই না থাকে, সেও একটা মস্ত অভাব যার কল্পনা পর্য্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এবং সেই মহা অভাব থেকে কি আবার বড় অন্য প্রকার ক্রিয়া আরম্ভ হবে না যাহা হইতে আবার তিনি ও আমি এবং আমাদের উভয়ের অভাববোধ ও ক্রিয়া কোন অজানা উপায়ে পুনর্ব্বার সূচিত হবে?

এখনও দুইটি প্রশ্ন মনের মধ্যে রয়ে গেছে। কোথায় সাধন আরম্ভ করব? কি করে তা' চলবে? আরম্ভ করব অভাববোধে, যেমন নাড়ীকাটা শিশুর জীবন আরম্ভ হয়। হাত পা ছুঁড়ব, মাথা খাটাব, হৃদয়কে চঞ্চল থেকে আরও চঞ্চল করব—যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম, সব যেমন জননী চাইবেন, প্রকাশ পাবে। এই সংসারের চারদিকেই সেইরূপেই ত দেখছি। ঐ যে গাছটিতে ফুল ফুটেছে, ওর যে মাতা বৃক্ষ, যাহা জগন্মাতার ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র, ক্ষুদ্র ভাবে ধরা দিয়েছেন জীবনের প্রারম্ভে; তাঁর রঙ, রস, আনন্দ, বেদনা ওর সবটুকুতেই কাঁটায় কাঁটায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐ বৃক্ষমাতা যখন জগন্মাতার রূপে হাত বাড়াবেন ঐ ফুলেই তাঁর পূজা হবে। ফুলের জীবন ব্যর্থ যাবে না। মাতা যদি বিলম্বের প্রয়াসী হ'ন, ফুল ফলে পরিণত হয়ে, উপরে উঠ্‌তে পারল না বলে, মায়ের বুকে হার হয়ে শোভা দিতে পারল না বলে, মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। সেই ফল দিয়ে জগতের মাতা হয়ত তাঁর আর কোন ফুলকে অর্থাৎ জীবকে পুষ্ট করবেন। সেই ফুলের মধ্যে যে আকাঙ্খা জমেছিল তাহা এই জীবের মনকে উতলা করবে; এই জীব জগন্মাতার জন্য ব্যস্ত হবে। তবেই ত বোঝা গেল, আজ আমার যে আকাঙ্খা, যে অভাববোধ, চলেছে তা' এই সামান্য জীবনে অপূর্ণ থাকলে আরও বৃহত্তর জীবনে পূর্ণ হবে। সব জীবনই ত মিলেমিশে এক। এক পুরুষ যদি গরীব হোল, তার পরের পুরুষ ধনী হবার আশা থাকলে, সে প্রতীক্ষার সুখটুকুও কি তাকে তুষ্টি দেয় না? নাই বা ফুল হয়ে মায়ের সেবায় লাগলাম। ফল হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ব। গরু, বাছুর, যে কেহ খাবে তার জীবন ত মাতা ধন্য করবেন। আবার তাদের দুধ মানুষের বাচ্চা খাবে। চলবে ক্রিয়া। বাড়বে অভাববোধ। আমার মাতার

জয় জয়কার হবে। আমি না হয় পরাজিত হলাম। আর হলুম না যে সে বোধও ত আসতে পারে? মায়ের পরাজয়ে যদি আমার জয় হয় ভাল লাগে বটে। কিন্তু আমার পরাজয়ে যদি মাতার জয়জয়কার হয় তা'তেও ত আমার খেলা সাঙ্গ হবে না? আর সত্য কথা বলতে কি, মা ও আমি ত মূলতঃ ভিন্ন নয়। কাজেই জয়পরাজয়ের কথাও উঠে না। অথবা তাঁর জয়ে আমার জয়জয়কার ও আমার পরাজয়ে তাঁরও পরাজয়। তবু খেলতে হবে মায়ের সাথে অফুরন্ত খেলা।

কি ভাবে চলতে হবে? আবার মায়ের সঙ্গে মনে মনে কথা কয়ে দেখি, কতদূর কি জানতে পারি। তিনিই আমাকে পথ বলে দিন্।

(২)

দ্বন্দ্বের সমাধান

কি ভাবে সাধনজীবনে চলতে হবে লিখ্‌ব বলে স্থির করেছিলাম। এইবার শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে এসে যে নূতনতত্ত্ব জেনেছি তার যথাসাধ্য আভাস দিতে চেষ্টা করব। এ সমস্ত ব্যাপারটা আমার হিসাবে এক কথায় ইংরাজীতে বলা চলে, "The Law of Affirmatives।" আমার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের বাণী এই ভাবেই এসে পৌঁছেছে। ব্যাপারটা নিজ অন্তরে যেমন বুঝেছি লিখে রাখ্‌তে চাই।

The Law of Affirmatives পালন করা অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার এক কথায় অর্থ পথে চলেই চলা অর্থাৎ বিপরীত ভাবের সমস্যায় মনকে বিচলিত না করা। বৃক্ষ দেখ, স্বীয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই একই ধারায় জীবন যাপন করে। ফুল দেখ, আলোকের জন্য যেদিকে মুখ ফেরাতে হবে আপনই সেই দিকে মুখ ফিরায় ও সেই দিকে মুখ রেখে

জীবন কাটায়। সূর্য্য যেমন প্রতিদিন নিয়ম মত আসে যায় তাহার ত ত্রুটি দেখা যায় না। জন্তুদের জীবনের মধ্যেও একটা ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির ইতিহাস পাওয়া যায়। সকলের গতি যেন নির্দ্দিষ্ট দিকে চলছে, কে নির্দ্দেশ করছে? পরমদেবতার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সবেতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই ইঙ্গিত তাহাদের সকলের অন্তরেতে সঞ্চিত রহিয়াছে।- প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনের এমনই রহস্যময় সমন্বয় যে তাহাদের সমন্বিত ধারা নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে পরিস্ফুট হয়ে,বর্দ্ধিত হয়ে, তাহাদের সম্মিলিত ঐকান্তিক মঙ্গলের জন্য আত্মপ্রকাশ করছে।

কই, গোলাপফুল ত পদ্মফুল হতে চায় না। কাঁটাল গাছে ত আম ফলে না। দিনের বেলা চাঁদের আলো ও রাত্রে সূর্য্য উঠবার কোন সম্ভাবনাই ত দেখা যায় না। সব যেন প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম ত কম জানে না, তবে কেন তার জীবনে সাধ যায় যে একবার সে গোলাপ হবে, অন্য সময়ে পদ্ম হবে? কখনও ফুল হবে, কখনও ফল দেবে? কখনও নিরামিষ খাবে, কখনও আমিষ? কখনও দ্বৈতভাবে উপাসনা চলবে, কখনও অদ্বৈত সাধনা এসে পড়বে? নিজ প্রকৃতির মধ্য থেকে যদি এইরূপ হয় ত ভাল। কিন্তু পরের দেখে, শুনে, তুলনা করে, যা হবার নয়, যার জন্য সঙ্গতি আর নাই, তার জন্য ইচ্ছা হয় কেন?

আবার এইরূপ ইচ্ছা হওয়াও স্বাভাবিক বটে। মানুষ যে ক্রমোন্নতির স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে, সব অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে করতে সেই অনন্ত দেবতার দিকেই অগ্রসর হবে। সে পরের মত মানবে কেন প্রাকৃতিক নিয়মের বশ্যতা? ভগবানই ত প্রকৃতির নিয়মের সৃষ্টি করেছেন মানুষ ভগবানকেই কতবার স্বীকার করতে চায় না, তাঁর রচিত

নিয়মকানুনে কেন সে চিরটা কাল কর্ণপাত করবে? সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, পথ তার অধীন, লক্ষ্য তার অধীন, সাধনা তার নিজের যেমন সুবিধা হবে তাইত সে করবে।

এ সব কথাই ঠিক। কিন্তু একবার এদিক্, একবার ওদিক্ করে ভেসে বেড়ানো মরারও অধিক। তাতে করে সাধনা জমাট হয় না। যেখানটা খুড়বে, সেইখানেই যদি খুঁড়ে যাও, জল পাবে। আর যদি জীবনভূমির আজ এখানে, কাল ওখানে, খুঁড়ে চল, গর্ত্ত করতেই যাবে, আঘাতের পর আঘাতে তোমার নিজের জীবনই ওষ্ঠাগত হবে, কিন্তু ভগবৎকরুণার উৎস আবিষ্কার করতে পারবে কি? ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, যদি ভগবানের শরণ লও, তোমার যেমন সুবিধা হয় যদি একবার অভ্যাস করে লও, দেখবে প্রতিদিন একটু একটু করে বল সঞ্চয় হবে, আনন্দ পাবে, ভয় ও লজ্জা থাকবে না, হয়ত তুমিও দু'দশজনকে আনন্দ দিতে পারবে। খাওয়া, স্নান করা, ঘুমান, এসব সম্বন্ধে নিজের মনের মত বিধি করে নিতে পারো ও পালন করতে পারো, শুধু ভগবানের বেলাই কি তুমি বোকার মত জীবন যাপন করবে? আফিম যারা খায়, মদ খাওয়ায় যাদের আসক্তি, তারাও জানে কখন তাদের নেশার সামগ্রী চাই। মানুষের মধ্যে এত বুদ্ধি, এত আগ্রহ, কেবল ভগবানের বেলাই কি, যিনি সব নেশার সেরা নেশা, তাহা খাটবে না?

আহার বল, ঔষধ বল, নেশা বল, অমৃত বল, সবই ত তিনি। "পথ কোথায়" বলে চীৎকার করলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রকৃতির মধ্যে নিয়ত যে শক্তি অবিরাম সকাল সন্ধ্যায় সঞ্চার হচ্ছে, সেই শক্তি যেমন তোমাকে সব বিষয়ে পথ বলে দিচ্ছে, ভগবান্ সম্বন্ধেও সেইরূপ পথ বলে দেবে নাকি?

যদি সত্যই বল, তাঁর কথা তোমার মনে আসে না, তাঁকে কি করে ভাববে তোমার জানা নাই, বেশ ত, সেই কথাই বসে বসে নির্দ্দিষ্ট

স্থানে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একলাটি ভাববে। ভাববে, "আমি ত জানি না কি করি।" যেদিন ক্ষুধায় জ্বালা অনুভব কর, খাবার পাও না, সেদিন কি কর? দুফোঁটা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেও ত তুমি তৃপ্ত হও? দাও না, সেইমত অশ্রুজল মায়ের চরণে নিবেদন করে। যিনি প্রাকৃতিক ভরণপোষণ দিচ্ছেন, জাগতিক জীবন দিয়াছেন, যাঁর করুণা অফুরন্ত, তিনিই তোমার অকূলের কূল হবেন। নিজে এসে সান্ত্বনা দিবেন। তিনিই ত গুরু। তিনিই ত সহায়। তিনিই ত জীবনের সব। অসুখ করলে ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি কর এ ডাক্তার, ও ডাক্তার, এ ঔষধ, ও ঔষধ, করে নির্দ্বন্দ্ব হতে পারো না কেন? তোমার জ্ঞান অথবা জ্ঞানের অভাব তোমাকে এই মত করেছে। দেখ পশু পক্ষীরা ত এরকম করে না। এরূপ করলে কি সব সময়ে উপকার হয়? উপকার হয়ও বটে। কিন্তু মনের শক্তি যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তার চেয়ে ভাল হয় না কি যদি ভগবান্‌কে সামনে রেখে, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে, ডাক্তার ডাকো, ঔষধ খাও, জীবন যাত্রার যা' কিছু সব নির্ব্বাহ্ কর? তাঁকে এই রকম করেই ত ধরতে হবে, এই রকম করেই ত তাঁর কাছে ধরা দিতে হবে। তুমি বলবে তোমার এত সময় নাই। প্রতিদিন এতটুকু সময় নাই যে তাঁর কাছ থেকে সব আদেশ নিয়ে, সেইমত সেদিনকার দিনগত পাপ ক্ষয়, অথবা একথা না বলে, দিনভোর পুণ্য সঞ্চয় করতে পারো? নিজের সব কাজে তাঁকে সঙ্গী করে নিতে পারো না কি? কত ছুটি পাও বল দেখি, তাঁর নামে। ধর্ম্মের নামে, ভারতবর্ষে যত ছুটি হয়, এত আর কোথাও হয় কি? বেশ ত, নিয়ম করে, মাঝে মাঝে যে ছুটির দিন পারবে সারাদিন ভগবানের নাম করে, তাঁর কাজ করে অর্থাৎ নির্জ্জনে তাঁকে ধ্যান করে কাটাতে পারো না? কোন্‌টা তোমার পক্ষে ভাল, তোমার অন্তরই তোমাকে বলে দিবে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে

না। আর যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে। জীবনের বেলা বয়ে যায়। আলো জ্বালিয়ে রাখো। আলোর পথে অগ্রসর হতে থাকো। মায়ের জন্য অনুকূল পথে উন্মুখ হয়ে অগ্রসর হও। কে কি বলে ভেবো না। আর অন্য কাজ করতে গিয়ে ত ভাবো না? ভগবানের বেলা এত নির্দ্দয় কেন? জীবন-বীণার সব তার যদি তুমি সংসারকে দিতে পারো, একটি তার তাঁর জন্য রেখো; সব ফুলের সাজি যদি প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারো, একটি কুসুম তোমার অন্তরের তৃপ্তি ও অতৃপ্তির রসে সিক্ত করে তাঁর পায়ে দিও; যত কথা জান সব কথা জগতের কাজে লাগাতে পারো কিন্তু সেই একটি অক্ষর যাহা জীবনের প্রথমে তোমার অস্ফুট ওষ্ঠে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ও যাহাকে সারাজীবনের পাথেয় বলে গ্রহণ করেছিলে সেই চিরশান্তিপ্রদ "মা" নাম তাঁরই উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিও। তোমার ভাব যতই অশুদ্ধ হউক্, তুমি ত তোমার সংসারের কোন কাজেই নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করো না, আর যেখানে গেলে শুদ্ধতা পাওয়া যায়, সেখানে যেতে যত কুণ্ঠা? কে তোমার সেবা করছে, কে তোমর দুঃখে দুঃখী, কে তোমার নিরুপায়ের উপায়? তাঁকে বঞ্চিত করলে কি তুমি নিজকে বঞ্চিত করবে না?

একটু একটু করে তাঁর পায়ের কাছে সরে এসো। যা' তাঁকে দেবে তাই তোমার হবে। দেখবে যা' দাও নাই তা'ও ক্রমশঃ সেই দিকে তোমাকে টানতে থাকবে। তোমার সমগ্র জীবন আর খণ্ড খণ্ড থাকবে না, অখণ্ড হয়ে যাবে। পার্থিব সুখ দুঃখ, মান অপমান সমস্তই কিছু আর তোমার থাকবে না। আর থাকলেও তাঁর হয়ে যাবে। ক্রমশঃ একেবারে নির্দ্বন্দ্ব হবে।

যদি ভগবৎকরুণার উপর তোমার এমন সহজ নিষ্ঠা না থাকে,

তা'হলেও মনে ভেবো না, তোমার উপায় নাই। তোমার অন্তর যা' বলে দেয় তাইত তাঁর আদেশ হবে। হবে না কি? নিজের অন্তরকে ত স্বীকার কর? বেশ, তবে সেইখানে কাজ আরম্ভ কর। যা তোমার অন্তর বলে তাই করে যাও। সর্ব্বদা কর। তাতেও সুফল ফলবে। জীবের ভিতরে যে তিনিও আছেন। তা'ও তুমি বুঝতে পারবে। তবে একটা কাজ করিও। তোমার অন্তর যা' বল্‌ল তা' আজ করলে। কাল তোমার অন্তর আবার সেই কথাই তোমাকে বলল, কিন্তু তুমি করলে না, এমন হলে কি তুমি তোমার অন্তরের কথাই শুনছ? আর যদি তোমার মনে হয় যে তুমি তোমার অন্তরের কথাই সে অবস্থাতেও শুন্‌ছ তবে তাই শুনো, তা'তেও তোমার মঙ্গল হবে। অনুক্ষণ বিনীতভাবে নিজের অন্তরের অনুগত হয়ে থেকো। অন্তর যদি কোন কাজে "না" বলে, করিও না। কিন্তু দেখ্‌বে মানুষের অন্তর "না" বলতে জানে না। "না" এর দিকে তার ঝোঁক নাই। সে সুধু "হাঁ" এর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। দেখ না, বাগানের ফুলটি যদি ছিঁড়ে এনে বসবার ঘরে জলের গেলাসের উপর সাজিয়ে রাখো, সে ফুলটিও সূর্য্যের আলো ঘরে যেদিকে দিয়ে প্রবেশ করছে, সেই দিকেই মুখ করে থাকে। কোন্‌দিকে আলো নাই, তার সন্ধান সে রাখে না। আলোর দিকেই নজর করাই তার স্বভাব। সেইরূপ মানুষের অন্তরেও এই একটা মস্ত গুণ আছে, সে আর সব বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু কিসে তার নিজের উপকার হবে সে বিষয়ে তার টন্‌টনে জ্ঞান আছে। বলতে পারো, এটা স্বার্থপরতা। এই থেকেই যদি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারো, দেখ্‌বে এই স্বর্থপরতার যা কিছু কলঙ্ক তোমাকে নির্দ্বন্দ্ব করতে পারছে না, সে সমস্ত ধুয়ে মুছে, নির্ম্মল হয়ে আসবে, তুমি নিজেই স্বরাট হতে পারবে।

নিজের প্রতি তোমার যেমন দাবী অন্যেরও তোমার প্রতি সেইমত দাবী একথা তুমি শীঘ্রই বুঝতে পারবে। নিজের মন যদি বিগড়ে থাকে, যদি তার মধ্যে লোভ, রাগ, অহঙ্কারের খেলা দেখ্‌তে পাও, অন্যের প্রতি এসব প্রকাশ করে কি ফল হবে বল? তুমি নিজের টুকু যদি বিগড়ে থাকো, অন্যের বিগড়ে কি ফল হবে? তুমি যার উপরে রাগ করলে, বা যার নিকটে অহঙ্কার প্রকাশ করলে, তাঁর মনের মধ্যে ত সেই সংক্রামক ছাপ দিয়ে দিলে, সে বেচারীকে কত কষ্ট করতে হবে বল দেখি? যদি ধর সেই বেচারীই আবার তোমাকে ভাল লোক জেনে তোমার কাছ থেকে সৎ উপদেশ নিতে আসে, তুমি তাকে কি উপদেশ দেবে বল ত? তুমি কি বলবে না যে এমনভাবে জীবন যাপন কর যে মনের যেসকল বৃত্তিগুলিকে তুমি ভালো বলে নিজে মনে কর, সেইগুলি নিয়ে সব সময়ে খেলা কোরো, মন্দগুলি আপনই ছেড়ে যাবে?

দেখো, এই কথাটি ভুলো না, ভাল নিয়ে থাকবে, যা' তুমি ভাল বলে মনে কর। দেখ্‌বে যা তোমার পক্ষে মন্দ তার চিন্তাটুকুও তোমার অন্তরে উদয় হবে না। সব ভাল হবে। পূর্ব্বেই বলেছি অন্তরের ধর্ম্ম "হাঁ" সূচক আজ্ঞা দেওয়া। সেই "হাঁ" তে সর্ব্বান্তঃকরণে "হাঁ" মিলিয়ে যাবে। অন্তর "না" বলে আজ্ঞা স্বাভাবিক অবস্থায় দেয় না, তার সেদিকে জীদ তুমি তৈয়ারী করবে না। তা'হলে দ্বন্দ্বের কোন সম্ভাবনাই আর উঠ্‌বে না। যদি ছোট ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করে কোন বিষয়ে, তারা কি করবে না এইরূপ কদাচ তাদের উপদেশ দিবে না। কি তাহারা করিবে, তা' তুমি যেমনভাবে বোঝ, তাদের আপন জেনে, বললে ক্ষতি হবে না। তাদের নির্ম্মল অন্তরকে গোড়া থেকে নির্দ্বন্দ্ব করলে তাদের অশেষ কল্যাণ হবে। "অবাধ্য হইও না", "ঝগড়া করিও না", "চুরী করিও না", এইরূপ আদেশ বা উপদেশ বা অনুরোধ কাহাকেও

জানাইয়া ফল কি? বরং বলিবে, "যাঁদের ভালবাসো তাঁদের বাধ্য হয়ো ভাই, যাঁরা তোমাদের আপন তাঁদের সঙ্গে মিলামিশ রাখবে, তোমার নিজের জিনিষ বলে যা' তোমার মনে হবে তাই গ্রহণ করলে আনন্দ পাবে না কি?"

গ্রহণেই ত আনন্দ এই আনন্দই জীবনের পথ। ইহাই লক্ষ্য, ইহাই চরম। আনন্দে আমরা নূতন লাভ করি, আনন্দের মধ্য দিয়াই জীবন যাপন করি, আনন্দের মধ্যেই এই জীবনের শেষ হবে, উপনিষদের এই মহাবাণী সর্ব্বদা সম্মুখে রাখবে। নিজেই আনন্দময় হয়ে যাবে। দেখ্‌বে তুমি শুধু আনন্দ পাবে তাহা নহে, যাহারা তোমার কাছে আসবে তাহারাও আনন্দ পাবে। তুমিও তাদের আনন্দে আরও অধিকতর আনন্দ করবে। এইভাবে আনন্দ শতগুণ, সহস্র গুণ বেড়ে যাবে। তখন বিপদে, সম্পদে, দুঃখে, শোকে সব ব্যাপারেই আনন্দ। পূর্ব্বেই ত বলেছি, নিজকে নির্দ্বন্দ্ব করলে প্রাকৃত জীবনে অগ্রসর হবার ইহাই সুন্দর পথ। নিজের স্বভাব দিয়ে অপরের পূরণ যদি করতে পারো তা'হলে ত ভগবানের কাজ করছ। তিনি তা'হলে তোমাকে তাঁর রাজ সরকারে চাকরীতে নিযুক্ত করেছেন বল্‌তে হবে। তবে কি তুমি বিনা মাহিনার চাকর? সে কথায় কাজ কি?

আনন্দ যখন মানুষ পায় তখন আর কি সে বেতন চায়? আনন্দ পেলে ক্ষতি আর কোথায় যে ক্ষতি পূরণের কথা উঠবে? তখন সবটুকুই ত লাভ। জীবন দিয়ে লাভ, জীবন রেখে লাভ, জীবনে যা' পেয়েছি তাতে লাভ, যা' পাইনি তা'তেও লাভ। আনন্দ এমন একটা সামগ্রী, যাহা পেয়েছি, যাহা পাইনি, যাহা পাব না বলে মনে করেছিলাম সব মধুময় করে দেয়। সুখ বা পুণ্য অহঙ্কার আনতে পারে। আনন্দ সঙ্কল্প

এবং অহঙ্কারকেও অন্তরমধ্যে বিনীত করে দেয়। অন্তরে যে দীনতার উদয় হয় তাহা ভগবৎ গুণ, তাঁরই দীনতা, তিনিই দীনবেশে ভক্তের অন্তরে উদয় হয়ে আনন্দসুধা পান করেন।

এখনও কি বলবে, ভগবানকে স্বীকার কর না? ভগাবান্ কি তোমা ছাড়া? তোমার আনন্দেই ত তাঁর আনন্দ। আনন্দ কথাটার অর্থ কি? যখন আপনা হতে অন্তর বাহির দুলে উঠে, কোন কিছু হেতু পাওয়া যায় না, কোন কিছু উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না, কোন কিছুর দাবী দাওয়া মনে আসে না। মা'র যেমন শিশুকে খাইয়ে আনন্দ হয়, আবার শিশুর যেমন মায়ের হাতে খেলে আনন্দ হয়। বলবে এ'টা স্বার্থপরতার আনন্দ। নিজের বলেই ত আনন্দ হয়। দেখ আনন্দ সব সময়েই হয়। আনন্দ যখন পাও, তখন পর বলে কোন জ্ঞান থাকে কি? তোমার নিজ তখন হারিয়ে গেছে, তুমি আত্মহারা হয়ে গেছ, তবেই না আনন্দ পাও? সিনেমাতে গিয়ে যখন ছবি দেখ, তোমার সময়ের জ্ঞান, স্থানের জ্ঞান, তোমার নিজের সুখদুঃখের জ্ঞান, তোমার থাকে কি? আর যদি থাকে তা'হলে তুমি আনন্দ পাও না এবং তা'হলে আর তুমি সেখানে যাবে না। এ সব দ্বন্দ্ব তোমার মনে থাকে না বলেই ত তুমি আনন্দ পাও অর্থাৎ সিনেমাতে যে ছবি তুমি যখন দেখো, তোমার মনে হয় তুমি নিজকেই দেখছ, যা' গান শোন, যা' কথাবার্ত্তা হয়, যে সব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে তোমার নিজের খেলাই ত তুমি দেখ? নিজকে না দেখ্‌লে, না পেলে কি আনন্দ হয়? এই নিজকে পাবার জন্যই আমরা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি। যে দিন এই বিশ্বসংসারের নাট্যশালা সেই মত হয়ে যাবে, যেদিকে নয়ন ফিরাব দেখ্‌ব আমিই রয়েছি, আমিই পাচ্ছি, আমিই দিচ্ছি, সেদিন এই ক্ষুদ্র জীবন একেবারে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে, দ্বন্দ্ববিহীন

হয়ে, কোথায় গিয়ে মিশবে বলতে পারো? সেদিনও থাকবে এই একই সত্তা, যা' আজও রয়েছে, শুধু তোমার জানা নাই বলে তোমার মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিবাদ। সেই যে আনন্দময়ের সত্তা, তাকে কে কবে দূরে রাখতে পেরেছে? দূরে রাখবার কথাটিও মনে আসবে কি? হাঁ, কাছেই আনন্দ, আমার বুকের মধ্যে আনন্দ, আমার মুখের বাণীতে আনন্দ, আমার লেখনীতে আনন্দ, আমার স্পর্শে আনন্দ, আনন্দ আমার চক্ষের জলে। আর কেহ নাই বা স্বীকার করল? আমি ত সব সময়ে হাসিমুখে প্রসন্নচিত্তে স্বীকার করব। আমি করলেই আমার হবে। তখন সবাই অলক্ষ্যে আমার হবে। আনন্দময় আমার হবেন। আনন্দ সকল দ্বন্দ্বের অবসান করবে। তিনি ও আমি আমি ও তিনি, এক হয়ে যাব। এক ত আমরা চিরদিন আছি। আছি না কি? কালের অপর পারেও আমরা মিলে মিশে একাকার হয়েই ত আছি।

কিছুই ত ত্যাগ করা গেল না। তবে ত্যাগের কথা উঠে কেন? কেন ছোট বেলা থেকে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয় "ত্যাগ কর"? আলস্যতাবশতঃ যদি কিছু করতে পারলাম না, মনকে প্রবোধ দিই, ইহা ত্যাগ করলাম। কিন্তু ত্যাগ হইল কি? কোন একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য একটা সামান্য কিছু ত্যাগ করলাম, কিন্তু ত্যাগ হোল কি? যাকে অর্থাৎ যে বিষয়কে ত্যাগ করলাম, চিন্তায় তার অস্তিত্ব কি আমার মনে রয়ে গেল না? এই ত জগতের ইতিহাসে মানুষ কত জাল ও জঞ্জালের ভিতর দিয়া এসেছে, কত ত্যাগ করেছে, কিন্তু আবার সেই সব ব্যাধি, মনের কলুষ, আপন হীনতা ও ক্ষুদ্রতা কি আবার ফিরে এসে আত্ম প্রকাশ করছে না? ত্যাগের চিন্তাটুকু পর্য্যন্ত থাকলে ত ত্যাগ হোল না। সে সমস্তই ত বীজরূপে অন্তরে রয়ে গেল। তবে কিসের অহঙ্কারে মানুষ বলে "ত্যাগ করলাম, এইবার শান্তি পাব? আসল ত্যাগ এভাবে হয়

না। প্রকৃতির মধ্যে দেখ, কি ভাবে ত্যাগ চলছে। সময় এল, অন্তরঙ্গের ইঙ্গিত মত গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত আপনই খসে পড়তে লাগল। আবার পূর্ণতর জীবনের দিন এল, তাঁরই আদেশমত অমনই নূতন পাতা দেখা দিল। প্রকৃতির মধ্যে যত নিবিষ্টচিত্তে দেখ্‌বে, বুঝতে পারবে সে ত্যাগ করবার পক্ষপাতী নহে, যে ত্যাগ আপনা হতেই হ'য়ে যায় তাহাই সে বারবার নানা উপায়ে ও কৌশলে দেখিয়ে যাচ্ছে মানুষকে যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা দেবার জন্য। তবে একথাও সত্য যে ত্যাগ করবার ইচ্ছাও ত মানুষের অন্তরে ভগবানই দিয়েছেন। সেই হিসাবে ত্যাগ করতে করতেও কাজ হবে। তবে "ত্যাগ করা"র চেয়ে যাহাতে ত্যাগ হয়ে যায় তাহাই লক্ষ্যস্থল নহে কি?

মানুষের সব চেয়ে প্রিয় জিনিস ত তার নিজের জীবন। এটাকে ত্যাগ করতে পারলে শান্তি হবে কি? মানুষ ত্যাগ করে না কেন? শুধু যে ত্যাগ করতে পারে না বলে তাহা নহে। যদি সে পারত তা'হলেও এরূপ ত্যাগকে সে ধর্ম্মজ্ঞান করত না। জীবন যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে শেষ হবে, সেই মুহূর্ত্তেই আপনিই জীবন ত্যাগ হয়ে যাবে। এ জীবন ত্যাগ হয়েও অন্যভাবে থাকবে না কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। সমগ্র জীবন সম্বন্ধে যেমনই হউক্ না কেন, এই কথাটি কিন্তু অনুক্ষন জেনে রাখতে হবে যে সকল বিষয়ে ত্যাগ হয়ে যায় ঈশ্বরের বিধানে, ত্যাগ মানুষ কোন কিছুকেই করতে পারে না। শুধু ভগবানের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় কখন ত্যাগ হয়ে যাবে। অসুখকে তাড়াতাড়ি করে যেমন তেমন জোয়ালো ঔষধ দিয়ে তাড়ান হোল, কিন্তু সে অসুস্থতার বীজ কি আবার শীঘ্রই যন্ত্রনা দেবে না? প্রকৃতির তাগিদ অনুসারে রোগী যখন সুস্থ হয়ে গেল

তখন আবার সে ব্যাধির তাড়না না আসা সম্ভব। তবে কি, সে অসুখের বীজ সে দেহে আর রহিল না? রইল বৈকি, যতদিন দেহ আছে, সেই ব্যারামের বীজ রয়ে গেল, কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এমন একটা কিছু গ্রহণ করা হয়ে গেল যার দরুন সে অসুখ আর নাও হতে পারে। দেখ না, একবার যার মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে, ডাক্তারেরা বলেন না কি যে যতদিন সে অসুখের অর্থাৎ বসন্তের বীজ রোগীর দেহে বর্ত্তমান থাকবে, তার আর সে অসুখ হবার সম্ভাবনা নাই? আজ কাল তাই ত সব কঠিন অসুখের ঐ একই প্রথা আবিষ্কার হতে চলেছে। যে বিষ শরীরে জন্ম নিয়েছে তাহাই সেবন করলে বা শরীরে ধারণ করলে সে ব্যাধি সেরে যাবে। এই জন্যই কথায় বলে, বিষে বিষ ক্ষয়। এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে বোধ করি বৈষ্ণব রসগ্রাহীগণ "বিষে অমৃত" আস্বাদন করেছিলেন। তবেই বোঝা গেল, বিষকেও মানুষ ত্যাগ করতে পারে না, ইহাও সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণ করে মানুষ বিষময় ফল অতিক্রম করছে, অবশ্য প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে। তবেই ত যাহা আনন্দ তাহা পান করলে মানুষ আনন্দলোকে পৌঁছাতে পারে, সেখানে আনন্দ ও নিরানন্দের সমীকরণ হয়ে যায় অর্থাৎ দ্বন্দ্ব থাকে না। মানুষ এই মুক্তিই চাহে না কি?

ত্যাগ যেমন করা যায় না, আপনিই হয়ে যায়, গ্রহণও সেইরূপ করা যায় না, আপনিই হয়ে যায়। যার যে ভাবে যতটুকু অভাব তাহাই গ্রহণ হয়ে যাচ্ছে। আমি গ্রহণ করব না বা গ্রহণ করতে পারলাম না বলে কাঁদলে ভবিষ্যৎ কিন্তু সেইমত স্থির হবে না। তবে এটা ঠিক, অভাববোধ আরও জেগে উঠে, তাতেও প্রকৃতির নিয়ম বদলাতে থাকে, বোকা ছাত্রও পরিশ্রম করে অনেক সময়ে অনেক কিছু অর্জ্জন করে লয় যাহা অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্র পেরেও পারে না। প্রকৃতির এই

নিয়মগুলি জীবনে পাঠ কর। ভাল যা' কিছু নিজ মনে গ্রহণ কর, তার জন্য কাঁদতে শিক্ষা কর, পরিশ্রম আপনিই হবে, ভগবৎকরুণার গোমুখী তোমার জীবনে আত্মপ্রকাশ করবে, গঙ্গার ধারায় পূতপবিত্র হয়ে জীবন যাপন করতে পারবে। শুদ্ধতার অভাব যেমন চাইবে পূরণ হবে। আর পাবে আনন্দ। কেবল শুদ্ধস্বরূপের সঙ্গ লাভের আনন্দই জীবনের সব মোহ, সব দুশ্চিন্তা কাটিয়ে দেবে।

তবেই বোঝা গেল, আধ্যাত্মিক জীবনে কেবল অর্জ্জন, এখানে বর্জ্জন নাই। ত্যাগ ত আপনা হতে হয়ে গেলেই ত্যাগ। তা'ও ত্যাগ হয় না। স্কুল ছেড়ে ছেলে কলেজে গেল, সে কি তার লেখাপড়া সব সেখানে বিসর্জ্জন দিয়া গেল? স্থানটা ত্যাগ করে গেল বটে কিন্তু তা'ও কি ত্যাগ হোল? সারা জীবন কি সে, সেই সব সঙ্গীদের, সেই আমোদ প্রমোদ, সেই শিক্ষার কেন্দ্রকে ভুলতে পারবে? কোথায় তবে ত্যাগ হোল? হাঁ, বলতে পারো যে স্থূলভাবে ত্যাগ হয়ে সূক্ষ্মভাবে রয়ে গেল। ভগবানের তৈরী ত্যাগের নিয়ম এইমতই বটে। এই যা' কিছু সংসারে দেখছ ও দেখছ না, পাচ্ছ ও পাচ্ছ না বলে মনে হচ্ছে এ সমস্তই ক্রমশঃ জাগতিক জীবনের অন্তঃকালে একেবারে ত্যাগ হয়ে যাবে কিন্তু উচ্চতর জীবনের অভাব মনে থেকে যাবে সূক্ষ্মভাবে, যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ থেকে যায়, এতটুকুও নষ্ট হয় না। তবে মানুষ যতই নির্দ্বন্দ্ব হয়, ও একটানা পথে, চিন্তায়, ভাবে, কার্য্যে , সকল সম্পর্কে, এই জীবনেই অবিচলিত থাকে, ততই সেই এক যিনি তিনি সর্ব্বময় হ'ন, বৈচিত্রের মধ্যে সেই একই স্থাপিত হ'ন ও তাঁর ইচ্ছামত সব না থেকেও থেকে যায় এবং থেকেও থাকে না। সকল ভিন্নতা অভিন্নতায় মিশে যায়। তখন ত এইখান থেকেই, এই সময় থেকেই, সব থাকা সত্ত্বেও সব হইতে মুক্তির আস্বাদ আরম্ভ হোল।

অবোধ মন আমার। তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও। তোমার ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। সব সময়ে "যে আজ্ঞা" বলে অন্তরে যে স্রোত বইছে তাইতে গা ভাসিয়ে দাও। প্রকৃতির ভিতর দিয়াই উচ্চতর প্রকৃতির প্রকাশ হবে, অপ্রাকৃতের দিকে অগ্রসর হবে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মিলে মিশে এক হয়ে যাবে, তিনি ও তুমি ত পৃথক থাকবার নয়। এই যে অভিন্ন ভাব ইহাই সনাতন, ইহাই ছিল, ইহাই আছে, ইহাই থাকবে। কালের অতীত হয়েও। তবে কেন তুমি অন্তরায় হও? নির্দ্বন্দ্ব হও। পাড় বেঁধে কত রাখবে? ধর্ম্মের স্রোত, ঈশ্বরের ইচ্ছার স্রোত সমগ্র জীবনভূমিতে বইতে দাও। তোমার এই জীবনেই সব পাওয়া হবে।

(৩)

মন্দির প্রতিষ্ঠা

শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে আমি যেটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় জীবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা তখনই হয় যখন মানুষ গুরুর সন্ধান পায়। গুরু কে? যিনি ভগবান্ তিনিই গুরু। আবার যিনি গুরু তিনিই ত ভগবান্। ভগবানের কাছে গেলে যেমন আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না সেইরূপ জীবনে গুরুর দর্শন পেলে আর উঠে যেতে ইচ্ছা হবে না। তবে কি গুরুকে ত্যাগ হয় না? কেন হবে না, যে ভাবে আর সমস্ত ত্যাগ হয় সেই ভাবে গুরুও ত্যাগ হতে পারে। আর যখন ত্যাগ হবে তখনও তিনি রয়ে গেলেন সঙ্গে, আরও সূক্ষ্মরূপে। তবে ত্যাগ হোল কোথায়? আজ ভগবানকে যে ভাবে পাচ্ছি, কাল প্রভাতে অন্যভাবে, অন্যরূপে পেতে পারি। তাই বলে কি আজ যে ভগবান্ দেখা দিলেন, তাঁর বাঁশী শুনা'লেন, তা' আমার জীবন থেকে ধুয়ে মুছে যাবে?

আজকের এই সকালবেলার আলো, এই মর্ম্মের কথা যা' আমার জীবনে সঞ্চিত হয়ে গেল, আমি না জানতে পারি কিন্তু সবই ত তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারে অক্ষয়রূপে রয়ে গেল। তাঁর জগতে কিছুই ত একেবারে নষ্ট হবার নয়।

সোমবার ইংরাজী ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ প্রভাতে শ্রীশ্রীমার সহিত আমার একটিবার নির্জ্জনে দেখা হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ যাবৎ এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমি প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম, আর তিনি করুনাময়ী মা, আমার সকল প্রশ্নের জাল ছিন্ন করে, আমার সকল সংশয় দূর করে, আমাকে অভয় দিচ্ছিলেন। সমস্ত কথাবার্ত্তা আমি যথার্থভাবে মনে রাখ্‌তে পারি নাই। কারণ আমি একলাটি তখন কথা গিলছিলাম, তাড়াতাড়ি যত পারি খেয়ে নিচ্ছিলাম, চিবুবার ফুরসৎ ছিল না। তা'ও তারই মধ্যে লোকজনের সমাগম হয়েছিল। তবে তাঁরা কেহ কোন কথা উঠান নাই। নীরবে অপেক্ষায় ছিলেন, কখন আমার কথা শেষ হবে। পথের ভিখারীরাও দেখলাম পথে যেতে যেতে মাতাজীকে ভুলতে পারে নাই। ভিক্ষা ত তাদের নিত্য আছে, সেই দিনকার সে শুভ সুযোগ তারাই বা ছাড়ে কেন ? মাঝে মাঝে তারাও এসে উপস্থিত হচ্ছিল ও মাতাজীকে দূর থেকে ভক্তি ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তাদের ভিক্ষাপূর্ণ হোল নিজ অন্তরে জেনে হৃষ্টচিত্তে নিজ গন্তব্য পথে চলে যাচ্ছিল। আমার মন সবার সাথে থেকেও শ্রীশ্রীমার কাছে পড়েছিল। শুধু মুখের কথায় প্রকাশ হচ্ছিল যে আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু অন্তর তাঁরই সন্ধানে ছিল। মায়ের মুখনিঃসৃত বাণীর যেটুকু বুকের মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পেরেছি তাহাই গৃহে ফিরে এসেই নোট করে রাখছি।

শ্রীগুরুকে প্রণাম করে তবে চিন্তার স্রোতে ভাসিলে, তাঁকে কাছে পাওয়া যায়। তাঁর কাছে মাথা নীচু করার অর্থ গাছের শিকড় যথাস্থানে

রাখা, যাহাতে শ্রীগুরুর করুণাবৃষ্টি যথাস্থানে বর্ষণ হয়। পরিণামে সমস্ত শরীর মন ও সমস্ত আত্মসত্তা লাভবান হয়, ফুল ও ফলে সমাকীর্ণ হয়। আমি ত আমার জীবনের অনাগত কালের কিছুই অবগত নহি। তাঁর চরণে নিজকে সমর্পণ করবার প্রয়াসটুকু যাহাতে আমাদ্বারা সম্ভব হয় তাহার জন্য শক্তির ভিক্ষা তাঁহার কাছে জানাচ্ছি।

এইবার শ্রীশ্রী মার কথাগুলি প্রাণ ভরে শুনি। শ্রীগুরুর আবির্ভাব হয় কেমন করিয়া?

(১) তিনি রূপ বা মূর্ত্তি গ্রহণ করে আসতে পারেন।

(২) তিনি ভাবরূপ অবলম্বন করে আসতে পারেন।

(৩) তিনি এমন অপরূপ প্রতীক বিগ্রহের ভিতর দিয়া আসিতে পারেন যাহাতে মূর্ত্তি এবং ভাবের সংমিশ্রণ সাধকের অন্তরে হইয়া যায়।

(৪) তিনি সব অবলম্বন, সকল বিগ্রহ ছেড়ে দিয়ে কেবল মাত্র অভাবরূপেই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

প্রত্যেকটির বিষয় এইবার অনুধাবন করবার চেষ্টা করব। আবার ভেবে দেখি।

(১) মূর্ত্তি গ্রহণ করবার জন্য তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যে কোন মূর্ত্তি নিয়ে আসতে পারেন। আবার দেখ না, শুধু গন্ধের মধ্যেই কত গন্ধ রয়েছে, রশের মধ্যে কত প্রকার রস, রূপের মধ্যে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইত্যাদি। একটি কোন বিশেষ মূর্ত্তিতে এলে পর সেই সম্পর্কীয় (যেমন গন্ধ সম্পর্কীয়) সব মূর্ত্তিগুলি আসতে থাকে। আবার নাও আসে। তাঁকে পাওয়া হয়, আবার পাওয়া হয়ও না। আবার ধর গন্ধ সম্পর্কীয় মূর্ত্তিতে তাঁকে পাওয়া গেল, তখন বাকিগুলি অর্থাৎ রূপ,রস, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি ভিতর দিয়াও শ্রীগুরুর আবির্ভাব হতে

পারে, আবার নাও পারে। এইরূপ সকল রকমে যদি তিনি ধরা দেন, তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই পাওয়া হোল, আবার হোলও না, কারণ তাঁকে বারবার সকল সময়ে সকল জানা ও অজানা উপায়ে পাবার ইচ্ছা ত বেড়েই যেতে লাগল?

(২) তিনি ভাবরূপে যখন আসেন, তখন আবার কত ভাবে আসতে পারেন। শুধু যদি প্রেমের ভাব অনুধাবন কর, সেখানেও দেখতে পাবে নানারূপ। নানবিধ সম্পর্কের ভিতর দিয়া প্রেমও বহুরূপ ধারণ করিতে সক্ষম। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে দেখ না, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ও রাধা ভাবের উল্লেখ আছে ত? তারই মধ্যে যে কোন একটি নিজ স্বভাবের অনুকুলভাব যদি তোমার কাছে ধরা দেয়, আর সবগুলি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকে। তাহারা সকলে কাছে আসে, আবার সরে যায়। পাওয়া যায়, আবার পাওয়া যায়ও না। পেতে পেতে অফুরন্ত বলে মনে হয়, ফুরিয়ে গেলেও।

(৩) তিনি অপরূপ প্রতীক মূর্ত্তি ধারণ করেও আসেন। জগতের প্রায় সকল জাতির ইতিহাসেই ইহা দেখা যায়। হিন্দু জাতির ইতিহাসে হিন্দুদিগের নিকট যে সকল বিগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে সে সমস্তই কত আদরের। যেমন, শিব, গণেশ, সুর্য্য, শক্তি, বিষ্ণু ইত্যাদি। এঁদের অপরূপ বলা হোল কারণ এঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে ভক্তের অন্তরের মূর্ত্তিও থাকবে, ভাবও থাকবে, আবার এসব ছাড়া অব্যক্তের সন্ধানও বেশী করে থাকা সম্ভব। তাই অনেক সাধকগণ এই পথেই যেতে চান।

মূলতঃ গুরুর সম্বন্ধে সাধকের অন্তঃদৃষ্টির ফল দুইপ্রকার হইতে পারে—যেমন না পেয়েও পাচ্ছি, এবং পেয়েও পাচ্ছি না। এই দুইই সত্য। যখনই "হাঁ"এর দিকে তুমি ঝুঁকে পড়বে তখনই দ্বৈত সাধনা

চলবে। আর যখনই "না" এর দিকে অন্তরের হাওয়া বইবে জানবে অদ্বৈত সাধনার স্রোত বইল। প্রথমটার বিষয়ে এতক্ষণ বলা হচ্ছিল। এইবার দ্বিতীয়টি আরম্ভ করা যাক্।

(৪) অদ্বৈত সাধনার পথে কেবল "নেতি" "নেতি" অর্থাৎ "ইহাতে হোল না", "ইহাতে হোল না" এইরূপ ভাব সাধকের অন্তরে এসে পড়ে। পাখীগুরু, মানুষগুরু, দেবতাগুরু, কিন্তু কাউকে পেয়ে বসে থাকলে পাখীত্ব, মৎসত্ব, মনুষত্ব পার্য্যন্ত গিয়েই থেমে যেতে হয়, এই "নেতি নেতি"র পথে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। অতএব সাধক চলেই চলেন, জ্ঞান অর্জ্জন হয়ে যায়, কিন্তু তৃপ্তি হয় কৈ? দ্বন্দ্বানি বাড়তেই থাকে। অভাবের শেষ কোথায়? জ্ঞান অথবা অনুভূতির সীমানা আছে কি? দ্বৈতবাদীরা অনেক সময়ে একটা সীমানা টেনে দিয়ে, নদীর যেমন পাড় বেঁধে দেওয়া হয় সেইরূপ, স্রোতকে গতিশীল রাখবার জন্য সচেষ্ট হ'ন। আবার কেহ কেহ পাড় বাঁধায় লক্ষ্য দেন না বলে ওরই ভিতর অদ্বৈত অনুভূতির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। দ্বৈতবাদীদের উভয়বিধ চেষ্টার মধ্যেই কিন্তু সম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি পুষ্টি ও পরিণতি হতে থাকে। অদ্বৈত অনুভূতির সাধক কূলের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, আরও বেশী করে গতিশীল হয়ে, ছড়িয়ে পড়ে, প্রবাহের পরিবর্ত্তে স্থির সমুদ্রের সাক্ষ্যাৎ পা'ন। অথচ উভয় দিকেই অনন্তকে পাওয়া যায়। কারণ স্থির থাকি বা গতিশীল হই, গুরুর কৃপা হলে অনন্ত লাভালাভের পথ আপনিই খুলে যায়।

কেহ যেন মনে না করেন যে অদ্বৈত সাধনা শুধু চরমে প্রকাশ পায়। অদ্বৈতভাব আদিতে ছিল, মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রকাশ হয় ও শেষে সাধনার ফলে সাধক এইভাবেই লীন হ'ন। আদিতে অদ্বৈতভাব ছিল যেমন সন্তান মায়ের সত্তার মধ্যে থাকে। আবার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া জগতে স্বরূপ লইয়া প্রকাশ পায় বলে জীবরূপী ভগবান্

অভাববোধ করতে থাকে ও দ্বৈত ও অদ্বৈতভাবের দোলায় দোদুল্যমান হয়। অন্তে দোলানি থামতে পারে, যখন আবার সে অদ্বৈত অনুভূতিতে পৌঁছায়। অথবা আবার হয়ত কোন মহাকাশে সেই কম্পনের সূক্ষ্মভাবে ক্রমোন্নতি চলতে থাকে। এ জীবনে অদ্বৈত অনুভূতিতে সমাধিস্থ হয়ে থাকলেই সাধন জীবন শেষ নাও হতে পারে। সমাধি আবার অনন্ত প্রকার, যেমন জড় সমাধি, ভাব সমাধি, শূন্য সমাধি, চৈতন্য সমাধি ইত্যাদি। তবে এই জাগতিক শরীরের জীবনের দিক থেকে দেখতে গেলে নির্ব্বীজ সমাধিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থাৎ যখন বীজ তপস্যার আগুনে ভাজা হয়ে যাবে, তখন আর তা' থেকে গাছ জন্মাবে না। এখানে জন্মাবে না অন্যত্র, উর্দ্ধতর কেন্দ্রে জন্মাতে পারে। তা'হলেও নির্ব্বীজ সমাধিকে মনে রাখতে হবে সাধক জীবনের লক্ষ্য ও ইহা সহজ হলে বুঝতে হবে যে অনন্ত সাধন জীবনের সূত্রপাত হোল। তার পরের ব্যাপার অব্যক্ত হলেও, ক্রমশঃ ব্যক্ত হবে; তবে সেইখানেই আপাততঃ পর্দ্দা টেনে দিয়ে অর্থাৎ গন্তব্যস্থান বলে মনে করলে সুবিধা হবে। কিন্তু সেইটাকেই চরম বলে জানলে আবার ভুলও হয়ে যেতে পারে। সাক্ষাৎভাবে বীজ আর জন্ম না নিলেও অপর কোথাও আসাক্ষাৎভাব জন্ম নিতে পারে। কেমন করে জানতে চাও? শোন তবে বলি। যেমন ধর যে মনুষ্য সংযম অভ্যাস করে জগতে সন্তান উৎপাদন করল না, কিংবা সেদিক থেকে যথাসাধ্য আত্মশক্তি ফিরিয়ে নিল, তখন তার মাথায় চিন্তা, হৃদয়ের ভাবের অভিব্যক্তি জগতের অপরাপর সন্তানদের উচ্চস্তরে জন্ম দিতে সক্ষম হবে না কি? তাইত বলা হয়, অমুক মনুষ্য অমুক আর্চাযাদেবের সন্তান, যেমন খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি।

ঐ যে গাছ দেখতে পাচ্ছ, উহার কি পাতার গণনা করা সহজ ব্যাপার? ফুলের? ফলের? কোন কিছুরই গণনার শেষ হয় কি? আবার

ওর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির হিসাব নিতে গেলে দেখবে তারও ইয়ত্তা নাই। সব দিকেই পরমেশ্বর অনন্ত তাঁর অফুরন্ত কৃপা, তাই মানুষ নানা রকমে তার ইঙ্গিত পাচ্ছে। আবার পাচ্ছে না বলে হাহাকার করছে। তবেই ত অনন্ত জীবন চলবে। এই পৃথিবীতে আমার সত্তার কতটুকুই স্পর্শ করে আছে, ইহা যেন সমুদ্র কিনারার বালুকণার মত, অথচ সেই বালুকণার ভিতর অনন্ত রকমের অনন্ত অভিজ্ঞতা, মানুষকে আশ্চর্য্য করে দিচ্ছে না কি?

সব সময়ে কেবল মনে রাখতে হবে, একের মধ্যে বৈচিত্র, বৈচিত্রের মধ্যে এক। গুরু এইভাবে আসেন, যান, বেড়ান,অন্তরে বাহিরে। তাঁর দিকে মুখ রেখে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যাপন করবে একটি মুহূর্ত্ত তা'হলে পর মুহূর্ত্তে আর বার বলে মনে হবে না। তাহারা সবাই স্বাধীনভাবে গুরুর চরণতলায় পৌঁছাবে। অনন্ত, আনন্দ, অনন্ত কল্যাণ হতে থাকবে। গুরুই ভগবান্। ভগবান্ই গুরু। ভগবানের অনন্তরূপ, গুরুও অসংখ্য। সকল গুরুকে গ্রহণ হবে তোমার জীবনে যথাসাধ্য। "না" বলবে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে আবার "না" কি? এখানে সবই "হা"। একের মধ্যে বৈচিত্রকে পাবে, বৈচিত্রের মাঝে এককে খুঁজবে। যখন একের মধ্যে বৈচিত্রকে পাবে তখন জাগবে আরও অভাববোধ। আবার যখন বৈচিত্রের মধ্যে এককে খুঁজবে তখন জানবে ক্রিয়া চলছে, স্তব, স্তুতি, পাঠ, সেবা, ইত্যাদি।

আচার্য্যদের কোন বিশেষ দলের বলে মনে আনলে দলের গণ্ডীভাব মনকে পীড়ন করবে। লোকে যা' বলে বলুক, তুমি জানবে সকলেই সেই অনন্তের স্পর্শ পেয়ে এক হয়ে গিয়ে ধন্য হয়েছেন, সেই জন্যই ত অনন্তদিক দিয়ে তাঁদের ভিতর দিয়েও সেই একের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদি বল সাম্প্রদায়িক মতগুলির মধ্যে এত বিরোধ কেন? সেও সেই এককে আরও নানা রকমে জানাবার জন্য। তা'তে করে সাম্প্রদায়িক মতগুলিও পূর্ণতা অর্জ্জন করে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যখন যুদ্ধ বাধে, তার মধ্যেও এই ভাব কল্যাণের বীজ নিহিত থাকে। সাম্প্রদায়িক মতগুলো পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ভিতর দিয়া একাকার হয়ে যায়। তাদের আরও সূক্ষ্মতর মিলমিশ স্থাপিত হয়, যদি পূর্ব্বে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সবের মধ্যে তুমি কেন নিজকে জড়াবে? সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পূর্ণতাই যদি তোমার জীবনের লক্ষ্য হয় তা'হলে জড়াতে পারো। তা'না হলে নিজেকে পূর্ণভাবে জানতে হলে জগতের ধর্ম্মাধর্ম্ম, মতামত, যেমন সেই একের শরণাগত হচ্ছে, তুমিও তাই হও না কেন? নিঃসঙ্গ হয়ে স্বধর্ম্মাচরণ করলে অর্থাৎ যে ধর্ম্ম তোমার অন্তরে নিহিত রয়েছে তাহা পালন করলে তোমার জীবন মন্দিরেই কি সকল বৈচিত্রের শান্তিতে মিলন হবে না?

আর একটা কথা। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মানব জীবনের এই দুইটা দিক্ আছে ত? প্রাকৃত দিকে তোমার সংস্কার রাজত্ব করছে। অপ্রাকৃত দিকে শাস্ত্রাদি নানাবিধ বিধান তোমার সেবায় নিযুক্ত আছে ত? যখন প্রাকৃত সত্তায় থাকবে তখন সংস্কারকে নিগ্রহ করার চেয়ে তাকে যতদূর সম্ভব ভুলিয়ে নিয়ে ও আরও সংস্কৃত করে কাজে লাগালে শীঘ্র শুভফল পাবে। তোমার উন্নতির জন্যই ত তার জীবন। আর অপ্রাকৃত সত্তায় সংস্কারের দ্বারা চালিত হবে না, তখন শাস্ত্রের দ্বারা, যাহা তোমার কাছে অনুকূল হবে, তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবে ইহার অর্থ ইহা নহে যে, যে শাস্ত্রের অধীনে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন তাহা তুমি নিজ ইচ্ছামত ছাড়িতে পারো। এইরূপ কার্য্য তুমি করিতে পারো, আবার পারোও না। পারো যখন তোমার অন্তর একবোরে অপ্রাকৃত ও ক্রমে

আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিবে বলিয়া তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আর পারো না যখন তোমার সংস্কার তোমার সঙ্গে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কারণ ইহা জানিবে যে, যে শাস্ত্রের বশ্যতা ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তোমার সংস্কার তোমাকে দিতেছে সে সংস্কারও ত সেই শাস্ত্রের আবহাওয়ায় প্রস্তুত হয়েছে। অতএব সেই সংস্কারই আবার সেই সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের যথাবিধি কার্য্যকরী সংশোধন আনয়ন করতে পারবে ও তাহাতে তোমার যথার্থ ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা আরও বেশী। জীবনের উত্তরোত্তর উন্নতির অবস্থায় অবশ্য বুঝিবে, প্রাকৃত জীবনের দাবী যত কম হয়ে আসবে, ততই এইরূপ সংঘর্ষের দুর্য্যোগ কম হয়ে আসবে। তবে সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনে যতক্ষন না প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিতেছ এই দুইটি নিয়ম পালন করিবে ঃ—

(১) প্রাকৃত জীবনে সংস্কারের "হাঁ" সূচক নির্দ্দেশ দ্বারা চালিত হইবে।

(২) অপ্রাকৃত জীবনে শাস্ত্রের "হাঁ" সূচক অনুশাসন দ্বারা ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবে। ইহাই পথ।

তাই বলে পুঁটলী বেঁধো না। পেয়ো, ফুরিয়ে ফেলো। যাকে পাও দিয়ে দিও। প্রাকৃত ধন ফুরাতে পারে, আবার তা'ও ফুরায় না। অপ্রাকৃত ধনের ইয়ত্তা নাই, তাহা সকল অবস্থায় অফুরন্ত।

সূর্য্য পূর্ব্ব গগনে উঠ্ছে। তুমি আকাশে তার আভাস দেখে বিমুগ্ধ হইতেছ। তোমার অন্তরলোক স্থির হইয়া আসিতেছে। খানিক পরে সূর্য্যের রশ্মি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে দেখ্তে পাবে। আবার যদি ভগবৎ কৃপা লাভ হয়, সূর্য্যের সাক্ষাৎকার রূপও হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে, আবার তাঁরই ইচ্ছামত পারবেও না। পরিশেষে দেখ্বে সেই সূর্য্যের আলোতে যিনি, তোমার অন্তর লোকেও তিনি। থাকবে কে?

যিনি ছিলেন তিনিই সম্পূর্ণ অধিপতি হয়ে থাকবেন।

আবার বলি, ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধে চারটি অবস্থা সম্ভব ঃ—

	ভক্ত	ভগবান্	মন্তব্য।
(১)	আছি	আছি	অদ্বৈতভাব।
(২)	আছিনা	আছি	দ্বৈতভাব।
(৩)	আছি	আছিনা	দ্বন্দ্বভাব।
(৪)	আছিনা	আছিনা	অস্বীকার্য্য।

(৪) অস্বীকার্য্য কারণ কোন সাধকই সকল সত্তা সম্বন্ধে "আছি না" স্বীকার করবেন না। অন্ততঃ সাধক জীবনের প্রারম্ভে স্বীকার করবেন না। যদি পরে কোন সময়ে স্বীকার করেন তাহা হইলে সে অবস্থার রূপান্তর ঘটবে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে।

(৩) দ্বন্দ্বভাব উন্নতিশীল ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় স্বরূপ। তাহা কি ভাবে পরিহার্য্য তাহা "দ্বন্দের সমাধান" অংশে দেখিয়াছি।

(২) অথবা (১) যে পথে বন্ধাময়ী মা কৃপা করেন, গা ভাসাইবে। তাঁকে ফুল দেবে, ফল দেবে, অন্ন দেবে, বস্ত্র দেবে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করবে। যা' তাঁকে দেবে তাই ফিরে পাবে। তাই যিনি জীবনের সর্ব্বময়, তাঁকে সব রকমে সব দিয়ে, তোমার সবটুকু সব রকমে পাবার প্রতীক্ষা করবে।

(৪)

ভক্তি ও যোগ

ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে সব কথা শ্রীশ্রী মার নিকট শুনিবার সুযোগ আমার হয় নাই। যেটুকু শুনিয়াছি বা শুনিয়া বুঝিয়াছি বা বুঝিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে জানাব। ইহার মধ্যে ইঙ্গিতের ভাগই বেশী। তবে সে ইঙ্গিতগুলিও আমার কাছে অমূল্য।

যদি ঠিক মত জানাতে না পারি সে দোষ আমার। যাহা কিছু সত্য সুন্দর সবই ত মা।

ঈশ্বরকে যখন কাছে পেয়ে পূজা করতে ইচ্ছুক হই ও এইভাবে নিযুক্ত থাকি তখন ভক্তি জন্মায় ও বাড়ে। ঈশ্বরকে দূরে অনুভব করে যখন কাছে যাবার জন্য মন ছটফট করে তখন তিনি দুরে থাকতে পারেন না, তখন তাঁকে হেসে কাছে আসতেই হয়। তখন সে হাসি সাধকের পক্ষে সংক্রামক হয়ে উঠে। সাধকের অন্তরও তাঁর মতই প্রসন্ন হয়। ভগবানের সহিত যোগ বাড়িতে থাকে।

যখন বৈচিত্রের মধ্যে থাকি ভক্তি রস হৃদয় হতে স্ফুরিত হয়ে সেই এককে অভিসিক্ত করে। বৈচিত্রের ভিতর সেই এককে পাইবার ইহাই কৌশল। পিতামাতার মধ্যে, ভাই ভগিনীদের মধ্যে, ফুলে, ফলে, আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, যিনি ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করছি, ইহাই ভক্তি। আবার ও সবের মধ্যে তিনি থেকেও নাই এইরূপ জ্ঞান যখন জন্মায় তখন মন ব্যাকুল হয়ে, কখনও কোন্ অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে চলে যায়, কখনও অন্তরের গুহাহিত স্থানে লুক্কয়িত হয়ে যায়। আর মনকে টেনে এনে বৈচিত্রের সাথে সম্মিলিত করা যায় না; তখন তিনি এক হয়ে, সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অতীত সব কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে, সম্রাটের মত সমস্ত দাবী করেন। তখন যোগের সূত্রপাত। এইভাবে ভক্তি ও যোগ দেখা দিলেও সাধারণতঃ ভক্তি ও যোগ ক্রমান্বয়ে পরে পরে জীবনে চলতে থাকে।

ভক্তি হলে মনটা ভিজে যায়। চক্ষুও জলে ভরে আসে। সব পৃথিবী জলময় মনে হয়। যেন মনে হয়ে ভেসে চলেছি বা ডুবে যাচ্ছি। জগৎ থাকেও বটে, আবার একটু করে সরতে থাকে। যেমন নৌকা ঘাটে

বাঁধা থাকলেও দুলতে থাকে, যখন কোথাও যাবার জন্য তাহাতে গিয়া উঠে বসি। সমস্ত সংসারটা সেইরূপ নৌকার মত হয়ে যায়। পারাপারের খেয়া মাঝি তখন জানেন, কখন পার করবেন বা কোথায় নিয়ে যাবেন। ঝড়ের ভয় হয় না যে তাহা নয়। পিছনে ফিরে যে দেখতে ইচ্ছা করে না,তাহা নয়। তবে সামনের আকর্ষণ, কি হবে তা' জানা না থাকলেও তার আকর্ষণ, বেশী উতলা করে। হাওয়ার সাথে প্রাণের হাওয়া মিশিয়ে দিতে, নিজেই নৌকা হতে ইচ্ছা করে। এ দেহ মন সবই ত নৌকা। জগতের সকল আরোহী, সকল সামগ্রী, এই নৌকায় আসীন। আমাকে বইতে হয় না। ভগবৎ করুণার সলীলে অবস্থিত বলে, যত ভার চাপুক না কেন, ভরাডুবি হয় না। যদি স্রোত থাকে, নৌকা দুলে ভেসে ভেসে চলতে থাকে। আবার সেই নৌকাতে যখন কাণ্ডারী হাল ধরে বসেন, তখন তার মত মজা আছে কি? সারি গান গেয়ে অথবা সবাই মিলে নাম সঙ্কীর্ত্তন করে তখন চলি, ভাবের পাল উড়তে থাকে, জড় জগতের আমি নৌকা হয়ে চলতে থাকি। ভগবৎ করুণার টান আমাকে জড়িয়ে ধরে নির্দ্দিষ্ট পথে জেয়ারের মুখে ছেড়ে দেবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য সেই জোয়ারের খবর দিবার জন্য আসে যায়, তাদের পানে তাকিয়ে থাকতেও ভাল লাগে। জীবনের বেলা তখন আর কষ্টকর বোধ হয় না। জীবনের দুঃখ শোক তখন সহনীয় হয়। একফোঁটা ভক্তি রস যদি জীবনে পাওয়া যায়, সমস্ত যা' কিছু আমার আছে ও নাই সব মধুময় হয়ে যায়। বল, একবার বল, একথা কি সত্য নয়?

মন বলে সত্যও বটে, আবার সত্য নহেও বটে। সত্য কেন তাহা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। অসত্য কেন তাহা এইবার জানাব। অসত্য এই কারণে যে তাঁর কাছে যাব, তাঁকে পাব, এই আশাটুকু নিয়ে, কেবলমাত্র বসে থাকা যায় না। মা যখন ছেলেকে বলেন, "তোকে এই ত এইবার

কোলে নিচ্ছি, আমার কাজটা হয়ে যাক্। তারপর আসছি বাবা, দুধ খাওয়াব, কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াব, একটু দাঁড়া বাবা" খোকার মনে কি তখন দেরী সয়? এক এক দণ্ড পল খোকার কাছে হাজার বছর। সব খেলনা তার ছাই বলে মনে হয়। মা যখন আসবেনই, তখন দেরী কেন? ভক্তের অন্তরে আগেকার মত জলের ভাব আর থাকে না। এখন তাপ উঠতে থাকে। এ তাপকে বৈষ্ণবের মত "বিরহানল" বলে জানলে আবার ইহাও সহনীয় হয়। কিন্তু তার বেশী এ তাপ অসহ্যও হতে পারে।

যদি দুঃসহ তাপ হয়, তাহার তুলনা নাই। পৃথিবীর তাপ ত ভাল, পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ভগবানের জন্য যে তাপ, সে যত পোড়ায় ততই পোড়াবার বাকি থাকে। মায়ের সন্তান ত আর পুড়ে মরতে পারে না। মা যার অনন্তময়ী, সন্তানও তার অনন্ত। সন্তানের সবটুকু পুড়ে ছাই হবে কি করে? আবার এ ত যেমন তেমন ছেলে নয়। এ যে মায়ের কোল পাবে। মায়ের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যাবে, যেমন জন্মাবার কিংবা প্রকৃত বলতে গেলে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হবার পূর্বে ছিল ও পর হতে পারে অথবা ধর্ম্মজীবন সাঙ্গ হলে পর, হবে। অথচ ধর্ম্মজীবনের কিন্তু আরম্ভ ও শেষ নাই। সেও ত অনন্ত। জীবনের অনন্ত পর্য্যায়ে, অনন্ত ভাবে, মা আনন্দময়ীর দেখা পাওয়া যাবে। তবে এখন কিন্তু দাহিকা শক্তির অথবা চাহিদার প্রাবল্য হবে। সাধক পুড়তে থাকবেন। ইহাকেই বলে যোগ।

আগুন যখন পোড়ে তখন উর্দ্ধমুখী হয়। জল যখন পড়ে তখন তাহা নিম্নগামী হয়। যোগ মানুষকে উর্দ্ধগামী করে, লোকলোকান্তর পার করে অনন্তধামে নিয়ে যায়। ভক্তি যখন মানুষকে নিম্নগামী করে, তখন যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ তার পশ্চাতে যাঁরা সব রয়েছেন তাঁদের

সকলের কাছে নীচু হয়ে তাঁদের সাথে সংযুক্ত হয়ে, ঈশ্বরের অনন্তলীলায় মগন হয়। যোগ পাহাড়ের মত। যত উপরে ওঠা যায়, আরও সুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায়, হয়ত কিছুকাল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা হতে পারে। তখন মানুষ পাখীর মত উড়িতে থাকে। পাখীও যেখানে যেতে পারে না সেখানে যেতে চায় ও যেতে পারে। ভক্তি নদীর মত, সে যেখানে যত গর্ত্ত আছে, নিম্নভূমি আছে, সব ভালবাসার নীরে ভরে দেয়। সেই জল স্থির থাকে না। কম হলে সেখানে শস্য ফলে, জীবজন্তুরা তা থেকে জীবন পায়। বেশী হলে তার সমুদ্র থেকে মেঘ উঠে যেখানে যা' শুষ্ক হয়ে পড়েছে সেখানে বর্ষিত হয়ে সে সমস্ত সরস করে দেয়। সবই সেই একের খেলা, তিনিই যোগ ও ভক্তির আরম্ভ ও সিদ্ধি। পাহাড় যেমন মেঘকে আটকে নিয়ে নদীতে পরিণত করে দেয়, নদীও সেইরূপ পাহাড় না থাকলে জন্ম নিতে পারে না যোগ ভক্তির অনুকূল, আবার ভক্তিও যোগ না থাকলে জন্মলাভ করে না। অর্থাৎ ভক্তির আরম্ভেও যোগ এবং যোগের মূলেও ভক্তি বলা চলে। কিংবা কোথায় শেষ, কোথায় আরম্ভ তাহা বলা চলে না। যেটা দেখ্‌ছি, সেইখানেই আরম্ভ তাহা বলা চলে না। যেটা দেখ্‌ছি, সেইখানেই আরম্ভ বলে মনে করছি। যা' দেখ্‌ছি না অথচ লক্ষ্যের মত অন্তরে স্থির রয়েছে তাহাই শেষ বলে মনে হয়। আসলে আরম্ভ যে কবে কখন হয়ে গেছে তাহা কে বলতে পারে? শেষ আছে কিনা সে ত আমি জানি না। মা জানেন। তিনিই একটু একটু করে ভক্তের বাঞ্ছাপূরণের জন্য জানিয়ে দেন। যেমন জানান সেইমত জানা হয়, অনুভূত হয়, আনন্দ হয়।

তবে এটা বেশীর ভাগই বোঝা যায় যে যোগ ছাড়া ভক্তি হয় না, ভক্তি ছাড়া যোগ নাই। মানুষের জীবনে যদি ঠিক এইরূপ না হয় তা'হলে পূর্ণতার আরও বেশী করে অভাব দেখা দেয়। যদি শুধু যোগ নিয়ে থাকা যায়, ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে উঠা যায় বটে

কিন্তু যে ভূমি ছেড়ে যাচ্ছি তার সঙ্গ ছেড়েও ছাড়ে কি? আবার জল হয়ে সেই সব স্থানে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না কি? তখন কিছুই হারায় না। অথচ হারায় বলে মনে হলে জলের স্রোত বেড়ে সমুদ্রে পড়ে মেঘ হয়ে আবার পাহাড়ের গায়ে আসবার সুযোগ ও সুবিধা দেয়। কি বলব্! এর চেয়ে বেশী যে আর বলতে পারি না। ভক্তি দিয়ে যেন যোগে পৌঁছাতে পারি। যোগ দিয়ে যেন ভক্তিতে গলে যেতে পারি। মায়ের করুণা কি হবে না? কোথায় ভগবান্, কোথায় সংসার, তার সংবাদ কে রাখে? আমাকে যেটুকু সত্তা তিনি দিয়েছেন, আমি পোড়াব আর গলাব, গলাব আর পোড়াব। আমার সত্তা যে অনন্ত সত্তা। ইহাতে অনন্তলীলা চলবে। আমার কি আনন্দ হবে না? আমার জীবন কি সার্থক হবে না?

আত্মশুদ্ধির আর ত কোন উপায় দেখি না। যিনি শুদ্ধস্বরূপ, তাঁর কাছে শরীর মনকে এনে ফেলে দেখেছি, এ শরীর মনে দুর্গন্ধ যে কোথা থেকে এসে যায় তা' নিজেই বুঝতে পারি না। একের মধ্যে বৈচিত্রকে যে পাই না তাহা নহে। আবার বৈচিত্রের মধ্যে যখন এককে খুঁজি তখনও একেবারে ব্যর্থমনোরথ কোন মনুষ্যই হয় কি? তবে এই আসা যাওয়া, এই চলা ফেরার সমতা রক্ষা অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। যেদিন হোল, সে দিন ত যোগ ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় হোল। যেদিন হোল না, সেদিন যেন কাপড় চোপড়, মনের ভিতরটা, হৃদয়ের খানিকটা, সবই যেন অশুদ্ধতা নিয়ে তখন মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছা করে। তখন আমি ক্লান্ত, শক্তিবিহীন। ইচ্ছা করে মাকে গিয়া বলি, "মা, আজ আমাকে স্নান করিয়ে দে, তোর সব কাজ ফেলে রেখে আজ আমাকে শুদ্ধ করে নে। তোর খোকা কি জগতে অশুদ্ধ হয়ে বেড়াবে? কারও কাছে যে মুখ দেখাতে পারছি না মা। লজ্জা হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে—আরও যদি

বেশী করে অশুদ্ধ হয়ে পড়ি! এই বেলা পরিষ্কার করে দে। না হলে, আর যে আমি পারি না?"

জানি না এইরূপ অবস্থায় সাধনার ক্রিয়া কিছু চলে কিনা। কিন্তু ভক্ত নিরুপায় হলে ভগবানের আসন টলে। মায়ের কৃপা হয়। আমার যদি যোগ, ভক্তি কিছু না থাকে, মায়ের তো আমার সবই আছে? আমার বন্ধ হলে তিনি আমার কাজ নিজের হাতে চালান। আমারই জীবনে তাঁর যোগ ও ভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। আমি তখন পরিশ্রম করি না, চেষ্টা করি না, অথচ পারিশ্রমিকের বেশী পাই, যা' নিজে চেষ্টা করে পারতাম না তা'ও হয়ে যায়। ভক্ত যখন ভক্তি ও যোগের কূলকিনারা পান না, তখন এইভাবেই ভগবান্ তাঁর ভক্তি ও যোগ নিয়ে ভক্তের সেবা করেন। ভক্ত যেমন ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, তার চেয়ে যে অনেক বেশী ভগবান্ ভক্তের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। আর তাঁরা উভয়ে যে মিলেমিশে এক। একই নিয়মের অধীন, আবার অধীন নয়ও বটে। অধীন এই জন্য যে উভয়ের টান যে অনন্তকাল রয়েছে। অধীন ন'ন এইজন্য যে স্বাধীনতা বর্জ্জন হলে সে ত দাসত্ব হোল, সাধনা হোল না। আমার সাধ যদি না থাকে, আর দাসত্ব করতে হয়, সে দাসত্ব নিয়ে কি তিনি বা আমি চিরদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারব? দাসত্ব ছেড়ে পুত্রত্ব অর্জ্জন করতে হবে সাধককে। তারপর আরও কত নব নব ভাব উদয় হয়ে উভয়কে এক করতে থাকবে।

তাই বলছিলাম, ভক্তের যদি কোন কারণে ভক্তি ও যোগ বন্ধ হয়ে যায়, ভগবানের ঘড়ি বন্ধ হয় না। আমার ঘড়ির কাঁটা ত তাঁর ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলানো। আর কোথাওকার আর কাহারও ঘড়ির সঙ্গে তখনই মিলিয়ে লওয়া যায় যদি সেও কাছেই অন্তরঙ্গভাবে থাকে। এই সঙ্গ পাবার জন্যই ত সাধুসঙ্গ করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা'ও যদি না

হয়, সূর্য্যের পানে তাকিয়ে বেলা ঠিক করা যায়। সূর্য্য ত আর কিছু নহে, মায়ের হাতে বাঁধা ঘড়ি। সবাইকে প্রত্যহ বলে যাচ্ছে, আর বেলা নাই, অন্ধকার হয়ে আসছে; চল, নিজের কাজে মন দাও। কি আশ্চর্য্য! মা ত সবাইকে একই সময় জানান না! ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন সময় জানান। কারও প্রভাত হচ্ছে। কারও বা দ্বিপ্রহর। কারও বা সন্ধ্যা হয়ে এল। কারও বা রাত্রি হয়েছে,—আবার নূতন প্রভাতের আশায় বসে আছে। সেই জন্য মনে হয়, কেহ যদি সময় জানতে চায়,না জানানই ভাল। তবে সে যদি অন্তরঙ্গ হয়, ঠিক বুঝে নিতে পারে, তা' হলে জানালে ক্ষতি নাই। নচেৎ অপরকে সময় জানান মানুষের কাজ নহে। এ কাজ পরমেশ্বর নিজেই করছেন। তিনিই ত কাল দেখিয়ে দেন। স্থানে নিয়ে যান। অবস্থান্তর ঘটান। আমি যদি মুগ্ধ হই, তাঁর মায়ায় তিনি আবার আমার মায়াসত্ত্বেও আমাকে বিমুগ্ধ করেন। আবার যখন করতে বিরত হ'ন তখন চলে ভক্তি ও যোগ আমার দিক থেকে।

তিনি যে আমার সাথে অনন্তযাত্রায় বেরিয়েছেন। প্রতিদিন প্রভাতে অনুভব করি তিনি কুমারীরূপে আমার হৃদয়াকাশে হংসের উপর অবস্থিত হয়ে কুশহস্তে সূর্য্যমণ্ডল থেকে নেমে আসেন। দ্বিপ্রহরের কঠোর রৌদ্রে তিনি ত নবীনা হয়ে আমাকে ছায়ায় ছায়ায় জীবনের কাজকর্ম্মে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। আবার সন্ধ্যায় দেখি আমার কর্ম্মফলের বোঝা তিনি বৃষের উপর চাপিয়ে বৃদ্ধার মত চলেছেন। আমি যেমন রূপ দিই, তিনি ত তাই হয়ে যান। আবার তিনি যেমন রূপ দেন, আমিও ত সেইমত হয়ে যাই। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি সবই ত এইরূপে বিনিময় চলে না কি? তিনি আমাকে দিলে তিনি নিজেই পান। আমি তাঁকে দিয়া নিজেই পাই। দেয় সেই একই, পায় সেই একই। মাধ্যে বৈচিত্র। নেওয়া, দেওয়া তাইত চলে। শুধু তিনি আছেন, এই সত্যটুকু মনের

মধ্যে থাকলেই এসবই সহজ হবে।

আর যদি না আছেন এইরূপ প্রত্যয় জন্মে, সেটাও যদি বেশী করে থাকে, তাতেও কাজ হবে। অবিশ্বাস তখন বিশ্বাসে দাঁড়ায়, তারও রূপান্তর চলবে। ছাড়ান নাই। কে কাকে ছাড়বে? মানুষ নিজেকে কি ছাড়তে পারে? তিনি আমাকে চান বলে ত আমি তাঁর সন্তান। আমার নাড়ীর মধ্যে সেই টান অনুভব করি। করি না কি? আবার আমি যে চাই তাঁকে, তা' যেন আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁকে জানায়। আমাকে চা'ন বলে আমার আমিকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন। আর এই সৃষ্টির, এই জীবনের সার্থকতা তখনই যখন আমি জীবন দিয়ে তাঁকে অনবরত চাইব। তাঁর দেওয়া দান তাঁকে ফিরিয়ে দেব। আমার ত আর কিছু নাই। শুধু মা আছেন। আছেন না কি?

যোগ ও ভক্তি বাড়লে ভগবানের সহিত যেমন সংযোগ বাড়বে, সংসারের সহিতও সুরে, ভাবে ও সর্ব্বাঙ্গীন রকমে ঐক্য রক্ষিত হইবে। ভগবানের সহিত যথার্থভাবে যোগ বাড়লে, দীনতার সহিত অনেক সময়ে ঐশ্চর্য্যও বাড়ে। আর ঐশ্চর্য্য হলেই তা' সকলকে দিয়ে নিজকে ভোগ করতে ইচ্ছা হয়। ইহাই ত ভক্তি। সবাইএর ভিতর ঈশ্বরকে পাওয়া এবং সবাইএর মধ্যে ঈশ্বরকে ঢেলে দেওয়া, দুইটাই ভক্তির দুই দিক্। ঐশ্বর্য্য হলে, জীবে (জীব অর্থে নিজকে) দয়া বাড়ে, দয়া বাড়লে ঐশ্চর্য্য আরও পাওয়া যায়। কূপের স্বচ্ছ জল অনেক কষ্টে তুলতে হয়। শুধু এক ফোঁটা বা এক গেলাস জল যাহা এই শরীরের জন্য দরকার কে তোলে? যত পারে মানুষ তত তোলে। আবার দূরে যদি পাওয়া যায়, নলে করে নিয়ে আসে। যদি নদীর সন্ধান মিলে, সেখানে গিয়ে অঞ্জলিভরে পান করে, সকলকে পান করায়। মানুষকে, পশুকে,

পাখীকে, সবাইকে, যে চায় তাকে, যে চায় নাই তাকেও। এইত দয়া অথবা নিজকে পাওয়া। এত দয়া ভগবানের বুকেই সম্ভব। কিন্তু যোগের ফলে মানুষের বুকে তাঁর নিজের সম্পদ, জীবে দয়া, অহেতুকী ভালবাসারূপে তিনি ঢেলে দেন। ভক্ত উতলা হ'ন।

ভক্ত কি এই শরীরের জীবন থেকে মুক্তির জন্য ব্যস্ত হ'ন? সমগ্র জীবন তাঁর লক্ষ্যের বাহিরে। এই মুহূর্ত্তটি তাঁর কাছে অনন্তকাল। এই মুহূর্ত্তের জন্য যাহা তিরস্কার ও পুরস্কার তাহাই তিনি ভগবানের নিকটে উপহার চা'ন। ভিক্ষা না পেলে তাঁর যে চলে না, তিনি যে বাঁচেন না। পুরস্কার সবার সাথে ভাগ করে ল'ন; তিরস্কার আবার ভগবানের কাছে যাবার জন্য পাথেয় স্বরূপ হয়। নরকে আমি কেন যাই? স্বর্গে যাবার পথ হবে বলে ত? এমন নরক তিনি কেন রাখলেন? আমাকে বারবার বেশী করে স্বর্গের আস্বাদ দেবেন বলে! আবার ওসব কিছু ভাল লাগেও না। তখন এক মুহূর্ত্তের চাওয়া পাওয়ার কথা মনে ঠাঁই পায় না। ইচ্ছা করে সমগ্র জীবনের দিক থেকে, একেবারে তাল পাকিয়ে, পুঁটলী বেঁধে, ঘর ভরে, পৃথিবীর যেখানে যত ব্যাঙ্ক (Bank) আছে সব জুড়ে, তাঁর কাছে মুক্তির সম্পদ চিরতরে চেয়ে নিয়ে সঞ্চয় করে বসে থাকি। সঞ্চয় বৃত্তিও ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু এর পর যে আবার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আবার যেগুলোকে পেয়েছি সেগুলোকে রাখা নিয়ে যে বিভ্রাট হয়। নিজের করে রাখা যে কত শক্ত, সে যে ভালবেসেছে সেই জানে। মুক্তিকে চেয়ে গ্রহণ করে দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা'তে মন ভরল না। সে ত পাওয়া হয়ে গেছে। আর একটা কিছু চাই। আসলে মানুষে মুক্তিও চায়, আবার চায়ও না। কারণ মুক্তি ও অমুক্তির উপরে অধিষ্ঠিত যে ভগবান্, তাঁকেই যে মানুষের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর প্রয়োজন অব্যক্ত থাকে। আবার তাঁর প্রয়োজন ব্যক্ত

হলে ভক্তের নিজের প্রয়োজন অব্যক্ত হয়ে যায়। মোটরের বাতি যেমন সামনে থেকে এলে মানুষের হাত-বাতি ম্লান হয়ে যায়।

ভক্ত ও ভগবানের সংসারের পথে এইরূপ লীলায় জগতের মহাকল্যাণ। এখনকার পাখীর গান, প্রভাতের আলো, জগৎ জোড়া প্রতীক্ষা তাহারাও ভক্তের সঙ্গে পূর্ণতা অর্জ্জন করবে। নিঃসঙ্গ হলেও ভক্ত পালাবেন কোথায়? সমস্ত পারিপার্শ্বিক বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির পালা যে তাঁর সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে, ঘুরছে চক্রাকারে সেই অসীম দেবতার চারদিকে, যিনি ঘুরছেন কিনা তা' তিনি নিজেই জানিয়ে দেন। ভক্ত তাহা জানিতে পারেন। হয় ত জানাতে চান, হয়ত চান না। কিন্তু সংসার জেনে ফেলে। ভক্ত, ভগবান্, সংসার সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হয়ে যান সকল রকমে।

সংসারের তুলনায় ভক্তের নিজ ভাবকে স্বাধীনভাবে জানলাম। আবার জীবনের আর একটা দিক্ আছে, যাহা পার্থিব জীবনের সাধারণ অবস্থায় অনুভূত হয়। এই জগৎ সংসার যেন ভগবানের জন্য ভক্তিসাধন ও যোগে ব্যাপৃত রয়েছে এইরূপ মনে হয়। তাই তাঁহাকে গুরু করে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হবার আর একটা পথ প্রকাশ পায়, যখন আর কোন পথ স্পষ্ট করে দেখা যায় না।

সমগ্র সংসার সেই পরমপুরুষের সঙ্গিনী ও সাধিকা। যখন আপনা হইতে আর কোন পথ পাওয়া যায় না তখন এই বিশ্বসংসারের সহিত পা ফেলে চলতেই আনন্দ লাগে। অথচ তাঁর উদাসীন ভাব থেকে লক্ষ্য হারান যায় কি? আর যদি বা লক্ষ্যহীনতা আসে অথবা উদ্দেশ্যের জালে জড়িত হই, সংসার তাঁর উদাসীনভাব, তাঁর পূজারিণীর বেশ, নিত্য নব নব উপায়ে গোচরে নিয়ে আসবেন যদি আমি সত্যই তাঁকে

গুরু করে থাকি। পথ খুলে যাবে।

কোথায় যাব? যখন একা ছিলাম, ভগবানের প্রতি ভক্তি ও যোগ আমাকে টেনে নিলে। যখন পারলাম না, সাধ্যাতীত বলে মনে হোল, ভগবানের যোগ ও ভক্তি আমাকে পথ দেখাতে লাগল। এখন আবার কুক্ষণে কি সুক্ষণে বলতে পারি না, সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই ভগবান্‌ও আমাকে পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ভুলে গেলেও দেখি যে তিনি কিছুমাত্র ভোলেন নাই। তিনি যে আমাকে ভুলে গেছেন এ যে আমারই মনের ভুল! কারণ তাঁরই ভক্তি ও যোগ জগৎ বীণার তারে তারে সঙ্গীতের মত বাজতে থাকে। আরও যদি দৃষ্টি সঞ্চারণ করি, দেখ্‌ব, সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, অণুপরমাণুতে যোগ ও ভক্তির অনন্তরূপে খেলা চলছে। বস্তুতঃ এখন আর কিছু দেখি না। দেখ্‌তে ইচ্ছাও করে না। যে দিকে নয়ন ফিরাই, যোগ ও ভক্তি যেন দুইটি রেলের লাইনের মত বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আবার তাহারা অনন্তে গিয়ে মিলে যায় না কি? যতদূর দৃষ্টি যায় তাই ত মনে হয়। কাহার জন্য তাহারা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে? আমার জন্য নয়? যদি আমার জন্যও না হয় এখন বুঝলাম এই দুইটি পাশাপাশি আছে। আর কি করতে আছে? ভগবান্ আছেন বলেই আছে। তিনি যদি না থাকেন বলে আমার প্রত্যয় জন্মায় তা'হলেও যোগ ও ভক্তির পথ থাকবে না কি? সেই অবিশ্বাস থেকেই ত তাঁর প্রতি বিশ্বাস আবার ফিরে আসবে। যেমন হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ জন্ম নিয়েছিলেন আমারই জন্য।

(৫)

জ্ঞান ও কর্ম্ম

"ধর্ম্মজীবনের দুইটি বিশেষত্ব" অংশে দেখিয়াছি যোগ ও ভক্তি অভাববোধের বিকাশ এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। আমার

মনে যেমন ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে বলা যায় জ্ঞান হয়ে যায় ও কর্ম্ম করা হয়। আবার এমনও হতে পারে যে কর্ম্মও হয়ে যায় এবং জ্ঞানও হয়ে যায়। ইহা কিন্তু অনেক পরের অবস্থায়। কিংবা হয়ত একটা মাত্র থাকে ও তাহারই ভিতর সব সমন্বয় হয়েও হয় না অথবা না হয়েও হয়। সাধারণতঃ জ্ঞান হয় ও কর্ম্ম করি। ইহাই আমি এস্থলে নানাভাবে বুঝিতে চাই।

কোনখান্ থেকে আরম্ভ করব? প্রাকৃতিক দিক থেকে? যাহা কোন কাজে লাগে না তাহাই যখন ফেলিয়া দিই তাহারই সার হইতে চমৎকার কপি জন্মায়, যার আস্বাদন থেকে আবার আমাদের পুষ্টি হয়। নষ্ট কাগজ ফেলে দিলে তা' থেকে আবার কাগজ হয়। আবার একটি একটি করে তুলার কণা তুলে এনে চরকার দ্বারা সব মিলিয়ে নিতে পারলে সূত্র তৈয়ারী হয়। এই ভাবেই কি ব্রহ্মসূত্র তৈয়ারী হয় না যাহা মানুষের প্রকৃত আচ্ছাদন সামগ্রী? আবার খাওয়া সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই দেখ, আমি রসগোল্লা খাই। কতদিক থেকে সব এককে জোগাড় করে রসগোল্লা হয় বল দেখি? তারপর ত খেলাম। যত ইচ্ছা তত কি খেতে পারি? না, পারি না। যতটা আমার একটা পেটে ধরে। পেট ভরল, ব্যাস্ , আর কে খায়? যতক্ষণ খাচ্চি, ততক্ষণ এককে নানাভাবে জানছি, সব ইন্দ্রিয় দিয়ে। পেট ভরে গেলে আর জানবার দরকার হয় না। তখন যে পেলাম। এই পাওয়া আবার চলতে লাগল, নানা ভবে। যেমন খিচুড়ীর ডাল চাল রান্না হয়ে গেলেও আলাদা করে বেছে লওয়া যায়। আমি বলেছিলাম, "মাতাজী, পেটের মধ্যে গিয়েও কি খাবারের মধ্যে পৃথক ভাব থাকে?" মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, থাকে বৈ কি? বস্তুতঃ থাকে না হয়ত। কিন্তু গুণে থাকে। রসগোল্লারও যত নানাত্ব আছে তাহা নানা গুণের সৃষ্টি করে। যদি এক হতে না পারে, রক্তের মধ্যে গিয়ে অথবা

অন্যভাবে শরীরে বিকৃতি আনতে পারে, যা' হতে আবার নানা অসুখ দেখা দেয়।" আমি নিরস্ত হলাম। শ্রীশ্রীমা বলেতে লাগলেন। যদি একত্বভাবে পাওয়া গেল তখন আবার সবকে পাওয়া গেলেও মানুষ অগুণকে নিয়েও নেয় না তাই তাহা মলমূত্র হয়ে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থায় যাহা পাওয়া হয়ে গেল তা'ত মানুষের হওয়ার ভাগে গিয়ে পড়ল? অর্থাৎ সেই রসগোল্লাটি এবার আমার সত্তার অংশ হয়ে গেল। গেল না কি? রসগোল্লা তখন "আমি" হয়ে গেল। এই রকম করেই ত সব খাবার আমিতে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সেই রসগোল্লার যা' কিছু তা' আবার আমি হয়েও আমাতে থাকছে কই? কত রকমে চিন্তায়, কার্য্যে, সেই রসগোল্লার যা' কিছু সব খরচ হয়ে যাচ্ছে না কি? তবে ত রসগোল্লাটি আমি হয়েও আমি হোল না। কিংবা আর এক বৃহত্তর কেন্দ্রর 'আমি'তে আমাকে পৌঁছে দিল। আবার আর একটি রসগোল্লা এইবার খাওয়া চলবে। এইভাবে খাওয়া চলছে। আর এই খাওয়া সম্বন্ধে আমি জেনেও জানছি না, পেয়েও পাচ্ছি না, হয়েও হচ্ছি না। অথচ এই সকল অভিজ্ঞতার সমন্বয় কি বারে বারে আমর মধ্যে চলছে না? অতএব জানবে, জ্ঞান পথের চারটি স্তর, জানা, পাওয়া, হওয়া ও এসবের সমন্বয়। তা'ও আবার বলি, সমন্বয় হয়েও হচ্ছে না; হয়েও হচ্ছে।

আমি মাতাজীর উদাহরণগুলি ভাবতে চেষ্টা করি। আবার রসগোল্লা খাই। ইহাকে যেমন জানা, পাওয়া, হওয়া ও এই সবের সমন্বয় করছি, এইভাবে সংসারের যাহা কিছু আমার গ্রহণ হয়ে যাচ্ছে তাহা সম্বন্ধেও এই চারটি স্তর আমার সকল অভিজ্ঞতা জুড়ে রয়েছে না কি? জ্ঞানের ত এই চারটি স্তর ওবং সব স্তরে কর্ম্ম জ্ঞানের সঙ্গী নহে কি? যাহা খাওয়া সম্বন্ধে সত্য তাহা ভাব বা ভাবনা রাজ্যে ও সত্য। প্রত্যেক ভাব

বা ভাবনা আমি জানি, পাই, হই ও সেই হিসাবে নিজতে পৌঁছাই। উদাহরণস্বরূপ সত্যকে আমি জানি, পাই, হই ও তাহার সমন্বিত অবস্থায় আত্মহারা হয়ে যেতে পারি। আবার প্রত্যেক অবস্থায় ইহাও বলা চলে যে আমি জেনেও জানি না, পেয়েও পাই না, হয়েও হই না ও আত্মহারার অবস্থাও ত ফুরাইয়া আসে। তবে যদি কোন যোগী পুরুষ নিরবচ্ছিন্ন আত্মহারা অবস্থায় ব্রহ্মকৃপায় কাল কাটাতে পারেন তাঁহার নিঃশ্বাস যেমন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গ্রহণ হইয়া যায় সেইমত শরীর মনের আহারের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সত্তা তাহাও বাতাস, আলো, জল প্রভৃতি পঞ্চভূত হতে সংগ্রহ হইতে পারে। তখন আর স্থূলভাবে জ্ঞান পথের সকল অবস্থার পরিক্রমার প্রয়োজন হয় না। তবে সাধারণতঃ বল্‌তে গেলে কোন একটায় থেমে যায় না মানুষের গতি, তাই জ্ঞানের পর্য্যায় অনন্ত বলা চলে। কোথায় শেষ করবে বল? অনন্ত রূপে, অনন্ত অবস্থায় অনন্ত যে অনন্তের কাছে ধরা দিচ্ছেন তার গণনা করা যায় কি?

আবার গণনা করা যায়ও বটে। তা' না হলে জ্ঞানের মাপকাঠি তৈরী হয় না, কর্ম্মের বৈচিত্র সুস্পষ্ট হয় না। অস্পষ্টতা যে মানুষ চায়, আবার সুস্পষ্টতাও চায়। মানুষ যতক্ষণ পারে গণনা করে, যখন পারেনা গণনা করতে গিয়ে বলে অসংখ্য। তাইত গণিত শাস্ত্রে যতক্ষণ গণনা চলছে ততক্ষণ ত চলছে, যৎক্ষণাৎ গণনা অনন্তের পানে চলল, অমনই সব যেন অপ্রাকৃতিক হয়ে যায়, গণনাতেও অনন্ত আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। মানুষ কি কোথাও তার কোন রকম জ্ঞানে অনন্তকে ছাড়তে পারে? আবার গণনার কথা ছেড়ে দিয়ে মানুষ যখন রেখা টেনে তার গণনার উপায় অপূর্ব্ব কৌশলে আবিষ্কার করল, তার মধ্যেও অনন্তের জ্ঞান ধীরে ধীরে এসে পড়ল। মানুষ বিন্দু থেকে আরম্ভ করল। তারই

সমষ্টি করে দাঁড়াল সরল রেখাঙ্গ—straight line। প্রাকৃতিক হিসাবে একটিও সরল রেখা দেখা না গেলেও মানুষ তার নিজের মনগড়া মাপকাটি ছাড়বে কেন? সেই সরল রেখা অবলম্বন করে মানুষ কত ছবি আঁকল, তিন কোণা, চার কোণা, পাঁচ কোণা, এম্নি সব। কিন্তু করতে করতে অনন্ত কোণা ছবির কথা তার আসতেই সে অবাক্ হয়ে গেল। অথচ প্রাকৃতিক হিসাবে শুধু বক্র রেখা চক্ষে পড়ে। যেমন নদী পথ কেটে চলে, মেঘ যেমন আকাশে উড়ে যায়, ঢিল ফেললে যেমন তা' আবার ফিরে এসে পৃথিবীর গায়ে পড়ে, আকাশ থেকে তারা খসে পড়লে যেমন রেখাপাত হয়। সবই বাঁকা নহে কি? তাও আবার এক রকম নয়। কত রমম বাঁকা পথ! মানুষ তারই ভিতর আবার নিয়ম আবিষ্কার করে, তার মনগড়া বিন্দু ও সরল রেখার সাহায্য নিয়ে। সে সব হিসাবই হয়েও হয় না, আবার না হয়েও হয়। মানুষ যত রকমে জ্ঞান অর্জ্জন করুক না কেন, শেষে কিছু হয়েও হয় না, আবার না হয়েও হয়। মানুষের মন আরও চঞ্চল হয়ে উঠে। তার জ্ঞানের অভাববোধ আরও বেড়ে যেতে থাকে। তারপর ব্রহ্ম কৃপা হলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মায়। যখন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকল জ্ঞানের রাজা, সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, নিজে এসে সামনে দাঁড়ান তখন দেখা যায় তিনিও ত্রিভঙ্গ মুরারী। সোজা হয়ে দাঁড়ান না, আমরা যে তাঁকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে জেনেছি, পেয়েছি ও হয়েছি। তাই তিনিও সেই ভাঙ্গারূপ বহন করে আমাদের সামনে প্রকাশ হ'ন। তাঁর যে মুরলীধ্বনি আমরা শুনি তা যে আমাদের কাণে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। আমরা জেনেও তাঁকে জানি না, তাঁকে পেয়েও পাই না, তিনি হয়েও তিনি হই না। তাই তাঁর আত্মপ্রকাশ হয়, আমাকে 'আমি'ময় করতে। তিনি ও আমি এক না হলে আমার পরিপূর্ণ 'আমি' হয় কি? 'আমি' এই 'আমি' পর্য্যন্ত যেতে পারছি কি? কিন্তু যেতে না

পারলে কর্ম্ম করতে থাকে। আবার সত্য বলতে গেলে মানুষ তার সমস্তটা দিয়ে জ্ঞান লাভ করে ও সমস্তটা দিয়ে কর্ম্মও করে। জ্ঞান দিয়ে অন্তর লোকের দীপ জ্বালায়। কর্ম্ম দ্বারা বহির্লোকের দীপ জ্বালা হয়।

জ্ঞান ও কর্ম্ম দীপ বল্লেই হয়। আমি জোনাকি, কেমন করে আলোর খবর দেব? যেখানে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত মানে সেখানে খদ্যোত বেচারী কি করবে? কিন্তু সে যে আপন জীবন জ্বালাতে চায়, আলোয় আলো করতে চায়। বাহিরে আলো, ভিতরে আলো, ভিতর বাহির উভয় মিলেমিশে আলোকময়। এই ত বিধাতার ইঙ্গিত মানুষের জীবনে, যে সে স্বপ্রকাশ হবে। আলের কথা বলা বড় শক্ত। কেহ কি এই সূর্য্যের আলো বর্ণনা করে অপরকে বুঝাতে পারে, বিশেষ যে কখনও দেখে নাই তাহাকে? অন্ধকে আলোর সন্ধান, যিনি চক্ষুহীনকে চক্ষু দেন, সেই পরমেশ্বরই দিতে পারেন। তিনি যখন ধরে থাকেন তখনই ত আলোর সন্ধান মিলে। আর তিনি ত ধরেই রয়েছেন। ঈশ্বরের বাড়ীর দরজা কখনও বন্ধ হয় না। মানুষ শুধু তাঁর ইসারা মত চল্লেই হবে। শুধু তাঁর ইঙ্গিত। অভাববোধ ও ক্রিয়া যতই বেড়ে যাবে ততই তাহা অধিকভাবে সম্ভব।

ব্রহ্মকে আমি যখন ধরি তখন তিনি "সগুণ" ব্রহ্ম যদি না হবেন আমি তাঁকে ধরব কেমন করে? আর আমাকে যখন তিনি ধরেন তখন তিনি "নির্গুণ"। অর্থাৎ তখন তাঁর কাছে আমার ধরা দেওয়া সার্থক হয় ও তখন কোন কিছুর দিকে আর আমার লক্ষ্য থাকে না। তাই তিনি নির্গুণ হ'ন। আবার যখন কোন পক্ষ থেকেই ধরাধরি আর থেকেও থাকে না অথচ মিলেমিশে এক হয়ে যাই তখন সগুণ ও নির্গুণ, সসীম ও অসীম, খণ্ড ও অখণ্ড প্রভৃতি সকল দ্বৈতভাবের উপরে অধিষ্ঠিত হয়ে এক যিনি তিনি সর্ব্বময় হ'ন। আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁকেই "পরব্রহ্ম" বলা হয়েছে। সেই অদ্বৈত "পরব্রহ্ম" আছেন বলেই

তাঁকে ঘিরে তিনি নিজেই সর্ব্বপ্রকারে রয়েছেন। তবে দ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন করে অদ্বৈতের অনুভূতিতে পৌঁছাইতে হয়। আবার পৌঁছাইলে পরে, কোন জ্ঞানই আর থাকে না, অজ্ঞানতা ও থাকে না। যেমন সাবান দিয়ে আমি যখন হাত ধুই, তখন ময়লাও চলে যায় ও সাবানের ফেনাও হাত থেকে ছেড়ে যায়। সেইমত জ্ঞান ও অজ্ঞান থেকে মুক্তিলাভ করলে যে অবস্থা আসে তাহা অব্যক্ত। তখন জ্ঞান ও কর্ম্ম, যাহা এই শরীর লইয়া সম্ভব, তাহা শেষ হয়। আবার ব্রহ্মার কৃপা যেভাবে হয়, তাতে শেষ নাও হতে পারে। তবে এখানে পৌঁছাইলে মানুষ আর জন্মমৃত্যুর অধীন থাকে না, সে অমৃত হয়ে যায়।

তখন আর কে কাকে পথ দেখায়? পথ দেখাবার কথা কেন বলিলাম? শুধ শ্রুতি ও স্মৃতির সীমানা জানাবার জন্য। যতক্ষণ দ্বৈতভাব আছে, ততক্ষণ পূর্ণ জ্ঞান হয় না। মনে করা হয়,মনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হয়, হারাতে হয়, হারাতে হারাতে পেতে হয়, এ সব স্মৃতির কাজ। আর যখন শ্যামের বাঁশী কাণের ভিতর দিয়া মরমে বাজিতে থাকে, তখন নিজের চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়া, কূলের মর্য্যাদায় কালি দিয়া, অকূল দরিয়ায়, অজানা সাথীর সাথে অভিসারে যেতে কিছুমাত্র লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, দ্বিধা, কিছুই থাকে না। তখন শ্রুতির আরম্ভ। অথচ শ্যাম এমনই মন মানাইয়া চলতে চান যে তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যথা গীতা ও ভাগবৎ স্মৃতি বলিয়াই পরিগণিত হয়। এগুলি যেন মনে করে করে লেখা। বেদ ও উপনিষদ শ্রুতি। সেখানে যেমন যা' অনুভূত হয়েছে, ঋষিদের কাছে তাহাই গীত হয়েছে ও পরে অনেক শতাব্দীর পর লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলি অনুভূতির বিষয়, মনের কারবার এখানে নাই বল্লেই হয়। আর যদি থাকে সে "অপ্রাপ্য" মন নহে উহা

বিজ্ঞানময় মন যাহা আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছায়। আসলে মন যখন থেকেও থাকে না অথবা কার্য্য করে না তখনই শ্রুতি হয়, ব্রহ্মবাণী শুনতে পাওয়া যায়। আবার যেই সমগ্র মন ফিরে এসে ভাগ বসাতে চায় অমনই সবটা স্মৃতি হয়ে যায়। যখন আনন্দ পাই, সে সময়ে কিছু জানিতে পারি কি? তখন যে আত্মহারা হয়ে যাই। আবার যৎক্ষণাৎ সে অবস্থা থেকে ফিরে আসি, অমনই মন সংগ্রহ করে রাখতে চায় পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে ও সেই কারণে স্মৃতি আরম্ভ হয়। স্মৃতিতে ভুল হইতে পারে তবে সে ভ্রান্তিও মায়ের স্বরূপ। শ্রুতিতে কিন্তু ভুল নাই। স্মৃতিতে কিছু অস্ফুট রয়ে যায়। শ্রুতিতে তাহা সম্ভব হয় না কারণ তখন একের শরণে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায় ও অভিনব স্বরূপের সৃষ্টি করে অথবা ইহা বলা চলে তখন ভক্ত ও ভগবানের ভেদাভেদ থাকে না বলে শোনা ও বলা, বলা ও শোনা, একসঙ্গে হয়ে যায়। গুরুর কাছে বসে যখন তাঁর কথা শুনি, মনন করি ও পরে নির্জ্জনে ধ্যান করি তখন শ্রুতি বাক্যের আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাই। আমার প্রাণ ভেসে যায়, আমার গান ভেসে যায়, আমার সব ভেসে যায় তাঁরই চরণে। আবার কালি, কলম, মন নিয়ে যখন লিখতে বসি, সে সবই স্মৃতিতে পরিণত হয়ে, ঐ দিগ্বিদিগন্তের পারে মিশে যায়, ফেলে রেখে যায় আমাকে এক অসহায় শিশুর মত! আবার আমি বলি, "মা, তুমি কোথায় গেলে?" মা তখন এক আকাশ ছেড়ে আর এক আকাশে চলে গেছেন। সেইখানে আবার আমাকে ছুটতে হয়। দুটি পায়ে ধরে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হয়, সেই আমার ভাঙ্গা ঘরে, যেখানে আমার অশ্রুজলের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখে আমি উঠে গিয়েছিলাম মায়ের সন্ধানে এবং জগতের কোন ঝড় বাতাস সে প্রদীপের শিখার কোন অনর্থ ঘটাতে পারে নাই। পারেও না। এমনই করে মায়ের সঙ্গে শ্রুতি ও স্মৃতির

খেলা চলে অফুরন্ত ভাবে। জ্ঞান বাড়ে, কর্ম্ম বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। দুইই রূপান্তরিত হতে থাকে। মায়ের সাথী হতে পারলে তাঁর অনন্ত গৃহস্থালী জুড়ে তখন আবার নব নব জ্ঞান ও কর্ম্মেরও ইয়ত্তা থাকে না। ইহা ত গেল অখণ্ডের সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্ম্ম। এবারে খণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্ম্ম একটুখানিক বুঝতে হবে না কি? খণ্ড ও অখণ্ডের মধ্যে প্রভেদ কি? খণ্ড কাহাকে বলে? যেখান হইতে দুঃখ যন্ত্রনা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। "আমার শরীর অসুস্থ, আমার হাতে টাকা নাই, আমার ছেলেটা আমার মনের মত হচ্ছে না" এই সব চিন্তা থেকে দুঃখ জন্মায়। এই দুঃখ কমে বাড়ে, আবার ভুলেও যাই। চিরদিন সমানভাব থাকে না। কিংবা একটার পর একটা উৎপীড়ন করতে থাকে, সারাজীবন, যদি সংসার নিয়েই পড়ে থাকি। শ্রীশ্রী মা বলেন, "সংসারে কে কবে সুখ পেয়েছে? জগৎটাই যে দুঃখময়।" কারণ ইহা সর্ব্বরকমে খণ্ডের মধ্যে আমাকে টেনে আনে। এই খণ্ডকে ছাড়া নয়, ইহাকে অতিক্রম করতে হলে অর্থাৎ না ছেড়েও ছাড়তে হলে অখণ্ডের আস্বাদ পাওয়া চাই। তখন এই যে ব্যাধির কেন্দ্র দেহ মন ইহা হইতে কি শান্তি, কি আনন্দ! টাকা থাকুক বা না থাকুক তখন গরীবকে একটি পায়সা দিয়েও কতখানিক সোয়াস্তি ও সান্ত্বনা! সকল দুরবস্থা সত্তেও ছেলে মেয়েদের সঙ্গলাভ যেন ফুলের বাতাসের স্পর্শের মত অন্তরকে তৃপ্ত করে! এই সব কোথা থেকে আসে? সসীমের ভিতরেই অসীমের সন্ধান, খণ্ডের ভিতরেই অখণ্ডের টান আকুল করে। অথচ বেশ করিয়া জানিতে হইবে, খণ্ডগুলিকে জোড়া তাড়া দিলেই পাওয়া যাবে না। আবার অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করলে অখণ্ডই থেকে যাবে, খণ্ডে আসা যাবে না। খণ্ডগুলি প্রাকৃত জগতের অন্তর্ভুক্ত সংসারের অধীন। অখণ্ড অপ্রাকৃত রাজ্যে

প্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রের অধীন বটে কিন্তু আবার অধীন নহে, কারণ সকল শাস্ত্র ত তাঁকেই ঘোষণা করেন ও ঘোষণা করে শেষ করতে পারেন না তা'ও জানিয়ে দেন।

যতই প্রাকৃত জগতের জ্ঞান আহরণ করব, কর্ম্মসাধন করব, ততই আমিও খণ্ডত্ব প্রাপ্ত হব। আর যৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যে পৌছাব তখনই জ্ঞান ও কর্ম্ম অখণ্ডের সীমানায় পৌছিয়া তাহারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রথমটায় আমি জগতের পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত। দ্বিতীয়টায় আমার আমির পরিণতির জন্য নিযুক্ত। দুইটাই পরস্পরের মুখাপেক্ষী হতে পারে, আবার যদি না হয় তা'হলেও কোন উপায় নাই। আর তখনও সেই নিরূপায়ের উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না কি? খণ্ড ও অখণ্ডের উপরেতে সেই নিরূপায়ের উপায় রয়েছেন যেমন সকল দ্বৈতভাবের উপরে অদ্বৈতভাব।

তিলকে তাল করা আবার তালকে তিল করা এই কি জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে চলছে না? মস্ত বড় বাড়ী তৈরী করলাম, তার পর একটি ছোট্ট চাবি দিয়ে সবাইএর কাছে তা বন্দ করে দিলাম। সেই চাবিটি বুক পকেটে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই রকম করে সেই অনন্তকে গড়ে তুলে সেই অনন্ত দেবতা একটি ক্ষুদ্র উলঙ্গ শিশুর অন্তরে তার চাবিকাটি সমর্পণ করে আমাদের পার্থিব সংসারে শুধু কান্না সম্বল দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু অনাদর করেন নাই। শিশু যতই কাঁদে, ততই দরজা খুলতে থাকে, ব্রহ্মময়ী মায়ের হাসি সেই দরজা দিয়ে উজান বেয়ে প্রবেশ করতে থাকে, শিশু হাত তালি দিয়ে তার নিজের জীবনের প্রাঙ্গনে ঘুরতে থাকে আর দরজা চারদিকে খুলতেই থাকে। আর যখন মনে করে যে সব বুঝি খোলা হয়েছে, তখন সব দরজার একটা মাপ সই চাবী আপন হৃদয়ের রক্ত ও মাংস দিয়ে শক্ত করে তৈরী করে ও তাহা সম্পূর্ণ হলে পরে যাহারা আসিবে তাহারা যাহাতে

খুলিতে পারে সেইজন্য সে চাবিটি রেখে অদৃশ্য হয়। এই চাবিকাঠি অনাগত কালের শিষ্যেরা হয়ত পূর্ব্বের আচার্য্যের চেয়ে বেশী কাজে লাগাতে পারে,আবার ব্যবহার না হলে মরচে পড়ে চাবিটা অকাজেরও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেমনই হউক না কেন, বিশ্বপিতা এই আগ্রহ প্রত্যেকের অন্তরে কম বেশী সন্নিবেশিত করে দেন যে সর্ব্বপ্রকারে, সকল দেহ মন ও অন্তর দিয়ে, মানুষ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা জগৎকে পুষ্ট করবে, ঈশ্বরের নিয়মকে পুষ্ট করবে, আবার নিয়মের ব্যতিক্রমের পথেও নব নব পথ আবিষ্কার করবে যতক্ষণ না সে পথেও নিয়ম এসে ধরা দেবে। এহরূপে আমার আমির ভাঙ্গা গড়া চলবে।

যে গাছ বীজ দিতে দিতে আর দেবে না, শুধু বীজহীন ফল দেবে কিংবা ফলও দেবে না, এমন সব গাছ আছে ত? যে গাভী দুধ দেবে, অথচ বাছুর দেবে না, এমন কামধেনু নাই কি? যে মানুষ জ্ঞান ও কর্ম্ম অর্জ্জন করবে অথচ তার বন্ধন বা মুক্তি কোন কিছুরই জন্য প্রয়াসী হবে না, এমনও হতে পারে না কি? এরা সবাই জগতের অধিপতির স্বভাব পেয়েছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম থাকবে, থেকেও থাকবে না। আবার না থেকেও থাকবে। তার নিজের ত কথাই নাই। সবই সেই "আপ-জ্যোতি-রস-অমৃতম্" চারটি স্তরের ভিতর দিয়া পৌছে যাবে সেই প্রাচীন মন্ত্রের অনুভূতিতে যাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "তদৈব শুক্রম্, তদৈব ব্রহ্মম্, তদৈব অমৃতম্ উচ্যতে।" (কঠ)

যে মানুষটির মধ্যে অমৃত সঞ্চয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষগণ, সকল আচার্য্য, সকল ঋষিমুনি, সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশকাল ও পাত্রের অতীত যিনি সব সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে যান। ঐ ছোট্ট উলঙ্গ শিশু যে কাঁদছে, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, তারই কান্নাহাসিতে এইরূপ ঘটতে পারে। তারপর যদি সে এখানকার খেলার কিছু ভোগ অসমাপ্ত রেখে যায়, হয় ত আবার এই পৃথিবীতেই আসতে পারে, কিন্তু তার

ভোগ অল্পের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলেই সে অমরলোকে চিরতরে চলে যায়। সেই জন্যই বুঝি মায়ের প্রাণ, যারা শৈশবে মারা যায় তাদের জন্য এত বেশী করে কাঁদে। তাহারা কাঁদাইয়া তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সব কিছু বাপ মা ও যাঁহারা তাহাদের জন্য কেঁদে উঠেন তাঁহাতের সমর্পণ করে যায়। ইহা ব্যতীত সাধারণভাবে বলা চলে যে মানুষ অমৃত হয়ে গেলে সে আর এখানে ফিরে আসে না। আবার সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর লোকে ব্রহ্মময়ী মায়ের ইচ্ছামত লীলা চলতে পারে কিন্তু এসবই অব্যক্তের অন্তর্ভুক্ত বলে আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে না।

শুধু আর একটি কথা বলিব। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, জন্ম মৃত্যু এসব পাশাপাশিভাব এই এখানকার জীবনকে ঘিরেই ত চলেছে। সকল জ্ঞানের উদ্দেশ্য দুঃখকে, পাপকে, মৃত্যুকে যতদূর সম্ভব লাঘব করা। সকল কর্ম্মের লক্ষ্য সুখকে, পুণ্যকে, নূতনতর জন্মকে মানুষের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। যতক্ষণ এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ততক্ষণ এসব নিয়ে থাকতেই হবে। তবে এ সব বালাই ছেড়ে যদি ব্রহ্মের বালাই নিয়ে অমৃতময় হওয়া যায় তাহারই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম প্রেরণা দিচ্ছে। আর ইহারই সঙ্গে জগতের সকল আধ্যাত্ম জ্ঞান সমন্বিত রহিয়াছে। আধ্যাত্ম-জ্ঞান কোন দেশ বা কালে আবদ্ধ থাকতে পারে না, আবার থাকে না যে তাও নয়। তবে জীবনের কল্যাণের জন্য, মায়ের প্রসাদে, ইহা ছাড়া আর পথ নাই। আর যদি সেও মা-ই জানেন। আমার চিন্তার এইখানে শেষ করি। মন যদি এখনও বলে রথ প্রস্তুত হলে সারথী আসবেন, তবে মনকে আর একবার বলি, সারথী অন্তরে বসে আছেন, তবে আর রথ প্রস্তুত হতে দেরী কেন?

(৬)

"আপ-জ্যোতি-রস-অমৃতম্"

মানব সত্তায় ব্রহ্মের কৃপা ক্রমে এই চারটি রূপ লইয়া বর্ষিত হয় তাহার উল্লেখ সন্ধ্যাবন্দনায় আমরা পাই। শ্রীশ্রী মাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ও তাঁহার উত্তর মত যতটুকু আপন অন্তরে বুঝিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রথমে প্রাকৃতিক জীবন দেখা যাউক্। আপ অর্থে জল। জলের সাহায্যেই আবার অন্নের সৃষ্টি হয়। অন্নজল বিনা জীব বাঁচে না। অন্ন মনের খাদ্য, জল প্রাণের খাদ্য। অন্ন দিয়া মন তৈরী হয়, জল দিয়া প্রাণ বর্দ্ধিত হয়। এইভাবে বৃক্ষ পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীব বাঁচে। কিন্তু আবার বাঁচে না, যদি সূর্য্যের কিরণ অর্থাৎ জ্যোতিঃর প্রসাদ তাদের ভাগ্যে না ঘটে। অন্ততঃ যতটুকু দরকার তা না পেলে তাদের চলে না। জল ছিল সত্তায়, জ্যোতি পেয়ে সত্তায় নূতন রকম জলের সৃষ্টি হোল যাহাকে রস বলা হয়। জল শুধু নিজকে জীবন দিয়াছিল। "রস" বিশ্বব্যাপী জীবন দিবার শক্তি, যাহা ফুলে, ফলে ও জীবের অন্তরে ভগবৎ করুণার নূতন উৎসরূপে দেখা দেয়, সকলকে এক করবার জন্য। এই রসের গুণে মানুষ মাতাল হয়, উন্মত্ত হয়। তার শিশুভাবও যে থাকে না তাহা নহে। কিন্তু ক্রমশঃ রসও মরিতে থাকে। রস তখন আর বহির্মুখীন হয় না, অন্তরমুখীন হয়। অনেক বৃক্ষ আছে, দেখ্‌বে একেবারে শুষ্ক, কাটলে পরে রসে ভরা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই রূপ নদীও হয়, যার উপরে কেবলই বালি, তলায় স্বচ্ছ চমৎকার জল। এদের সাধনা "অমৃতম্" অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন সেইরূপ বৃক্ষ আর ফল দেয় না কিংবা যদি দেয় বীজহীন ফল দিয়া থাকে,

সেইরূপে নদী যখন অমৃতময় হইয়া যায়, সে সকল চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, আর পৃথকভাবে রসসিঞ্চন না করিয়াও, তাহার সাথী নদীদের সাথে বহিয়া চলে। জীবের কল্যাণে অমৃতময়ীরূপে সহায়তা করে। শ্রীশ্রী মার ইঙ্গিত অনুসারে ভাবিতে ইচ্ছে করে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গিনী সরস্বতীরও এইভাবে দেখা পাওয়া যায় বলিয়াই কি প্রয়াগের সঙ্গমস্থলকে ত্রিবেণী বলে?

মানুষের অপ্রাকৃত জীবনেও এই চারটি যুগ, পর্য্যায়ক্রমে আসে বা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে বলা চলে, যদিও তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ আমাদের সহজলভ্য হয়। কারণ যাহা আছে তাহারই ত প্রকাশ হয়। আপ অর্থাৎ জল বলতে জীবন প্রবাহ বোঝায় যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষের অন্তরে অভাববোধ ও ক্রিয়া চলিতেছে। জ্যোতিঃ বলিতে সেই আলো, যে আলো হইতে সূর্য্য চন্দ্র তারকা প্রভৃতি আলো পাচ্ছে, তাহাই বোঝায়। রস বলিতে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সকল রস যাহা সেই পরম রসিক করুণা করে জানান তাহা বোঝায়। অমৃত যে তিনি নিজেই, তাই সাধক আপন পর ভাব অতিক্রম করিয়া তাঁর সত্তায় লীন হইয়া যান। জীব শিব ত একই। তাদের ভিন্ন করাই বা কেন? একই রহিয়াছে। তবে মানুষ ক্রমশঃ যেভাবে বোঝে তাহাই শাস্ত্রাদি নানাভাবে বোঝায়।

(৭)

ধর্ম্মজীবনে বাধাবিঘ্নের গ্রন্থি খোলা।

ধর্ম্মজীবনের বাধাবিঘ্ন যাহা সাধক কর্ত্তৃক অনুভূত হয় সেগুলি সম্বন্ধে মনে রাখলে সুবিধা হওয়া সম্ভব এই কথা শ্রীশ্রীমাকে জানাইলে তিনি যেমন বলিয়াছিলেন তাহা যতদূর স্মরণ রাখিতে পারিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মানুষের মন হোল শিশুর ন্যায়। সেই শিশু এটা চায়, ওটা চায়।

কিছুতে খুসী হয় না। যাহা পায় তাহা পেয়েই নিমেষের মধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলে। ভেঙ্গে ফেলে অথবা দূরে ফেলে দেয়। আবার অন্য কিছু চায়। মনকে খারাপ বলা চলে না। তার স্বভাবের ধারাই এই মত, চঞ্চল বালকের মত। সে শুধু শান্ত হয় ও আর অন্য কিছু চায় না (কারণ সব কিছু পায়) যখন তাহার মাতারূপী আত্মার নিকট সে অগ্রসর হয়। মায়ের কাছটুকুর জন্য কোন্ শিশু না অস্থিরতা প্রকাশ করে? মন হোল খোকা। আত্মা তারই ত মা।

মনের রীতি হচ্ছে হাসি ও কান্না। কান্নায় মন তার অভাববোধ জানায়। হাসি দ্বারা সে তার স্বাভাবিক পরিণতি খোঁজে। মন যখন আত্মাকে পায় না তখন কাঁদে। যখন পায় তখন হাসে। প্রথমটা হোল ধর্ম্মজীবনের প্রথম দিককার চিহ্ন। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ হাসি হোল ধর্ম্মজীবনের সার্থকতার অঙ্গ। ভাল করে কাঁদতে পারলে অথবা ভাল করে হাসতে পারলে, দুই প্রকারেই শরীরের গ্রন্থিসকল খুলিয়া যায়।

এই গ্রন্থিগুলির উল্লেখ হিন্দুসাধকগণ বারবার, তাঁদের সাধন জীবনের চর্চ্চায়, করিয়া থাকেন ও সর্ব্বদা এইগুলিকে খোলা রাখিবার জন্য যত্নবান্ হ'ন। গুরুর অর্থাৎ ভগবানের কৃপা হইলে জীবনের সব গ্রন্থি আপনা হইতেই খুলিয়া যায় ও মানুষ নিজকে অনায়াসে পায়।

প্রথম স্তরের গ্রন্থি হোল সম্পর্কীয়, যথা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শ। (এক্ষণে বলা যাইতে পারে ছয় রিপুকে শ্রীশ্রীমা ধর্ম্মজীবনের বাধাস্বরূপ ধরিলেন না। তাহাদের ত দ্বন্দ্ব সমাধানের ভিতর দিয়া কাটাইয়া উঠা হইয়াছে)। তাহারা সবশুদ্ধ পাঁচটি সংখ্যায়। এই পাচ জন সহায় হইতে পারে বা মনরূপী বাচ্চার অন্তরায় হইলে তাহাকে বিহ্বল করিতে পারে। তখন সে আর তার মায়ের ঘরটি স্মরণপথে রাখতে সক্ষম হয় না। সংসারের ধুলা কাদা মেখে বেড়ায় কিন্তু সন্ধ্যা হলেই বা তাহার পূর্ব্বেই তার মায়ের কথা স্মরণ আসবেই, তখন বাচ্চা

নয়নজলে অভিসিক্ত হয়ে মায়ের কোল ছাড়া হয়ে আর থাকতে পারবে না। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে এগুলো অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি কি মায়ের কোল নহে? (আমি ত "মন্দির প্রতিষ্ঠা" অংশে দেখিয়াছি এগুলির কাহাকেও অবলম্বন করিয়া, গুরু অর্থাৎ ভগবান্, ভক্ত সমীপে আসতে পারেন। কিন্তু যখন আর সে পথ দিয়া আসেন না তখন এই অভ্যস্ত পথগুলিরই আবার অন্তরায়স্বরূপ হয় না কি? সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে)। মায়ের কোল ছাড়া কি কিছু আছে? তার উত্তরে এই বাল যায়, সে বিচার তোমার বুদ্ধি না হয় জানল, কিন্তু মন কি তাহা স্বীকার করে লবে? মন যদি না কেঁদে উঠে অন্য দিকে যাবার জন্য, তা'হলে ত সেই তোমার মনমত পথ। কিন্তু মনের কান্না যখন থামাতে পারবে না তখন বুদ্ধি বিচারের কথা ত আসেই না। অর্থাৎ মন যদি বাহিরে যাবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তাহার মা ছাড়া কাহার সাধ্য তাহাকে ভোলায়! নির্য্যাতন করে তা'কে বশে আনা ত কঠিন ব্যাপার। নির্য্যাতনের দ্বারা কোন শিশুর শিক্ষা কি কোন দিন সম্পূর্ণ হয়েছে? তার সহজ সরল দৃষ্টিতে তার আপনস্বরূপ যাহাতে বিকাশ পায়, যাহাতে সে নিজকে যথার্থভাবে পায়, তারই ত নাম শিক্ষা। শাস্তি দিয়া, নির্য্যাতন করিয়া, বাহিরের প্রলোভন দেখাইয়া বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কে কবে বালকের সংশোধন করিতে পারিয়াছে? আর যদি পারিয়া থাকে সে অল্পকালের জন্য। সেরূপ পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয় কি? কিন্তু শিশুর মধ্যে যে অপ্রাকৃত শক্তি আছে তাহাকে যদি সে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, জীবনের কার্য্যগুলিকে খেলার মত যদি সে গ্রহণ করতে পারে, তাহা হইলেই একটা খেলা ফেলে আবার একটা খেলা, যাহাতে সে বাড়ীর পানে, মায়ের কাছে, ফিরতে পারে, সে খেলায় নিজকে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়। তখনই ত সংস্কারের গ্রন্থি খুলল। সব শিক্ষারই

মূল উদ্দেশ্য সংস্কারের গ্রন্থিকে মোচন করা। নূতন কিছু গড়া নয়। কেবল মোচন করা। নূতন গ্রন্থি জড়ালে আবার তাকেও খুলতে হবে। সংস্কারের বাঁধনকে মুক্তি দেওয়াতেই শিক্ষার সার্থকতা। তবেই ত প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতের দিকে শিশু অগ্রসর হতে পারবে।

এইভাবে রূপ, রস ইত্যাদি গ্রন্থিগুলির একটির পর একটি খুলিয়া গেলে শিশু-মন শিকল থেকে মুক্তি পায়। যদি কোন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর্কষণ বেশী রকম উৎপাত করতে উৎসুক হয় তাহার দিকে একটু বেশী দৃষ্টি রাখতে স্বতঃই ইচ্ছা জন্মায়। সেইরূপ অবস্থা নিকটবর্ত্তী হইলেই মায়ের কাছে শিশু প্রার্থনা জানাতে চায়,"মা, আর ত যেতে পারছি না, তুমি আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর"। এইভাবে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে কোন বাধাবিঘ্ন আর অন্তরায় হতে পারে না। শিশু সবল হয়। তখন মন হামাগুড়ি দিয়া রউক্ বা যেমন করিয়াই হউক্ মায়ের ঘরের দিকে অর্থাৎ আত্মার পানে যাইতে পারে। ইহাতেই ত মায়ের আনন্দ। মা ত ইহাই চা'ন যে খোকা তার নিজের বিক্রমে মায়ের কাছে অগ্রসর হবে। সে যে যেতে চায়, সে ত তার হাসিকান্নাই তাকে বলে দিবে। ইহ'রই ত হোল শিশু মনের পথ প্রদর্শক।

তখন একটি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দ ভাল লাগিবে যাহা মনকে শুদ্ধতা দেবে। আর সব ভাল লাগবে না। ক্রমে এই একটি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দ যাহা বৈচিত্রের স্থান অধিকার করে ছিল তাহা হইতেও বিমুক্ত হইতে মন চাহিবে। কারণ মনের ধর্ম্ম বাঁধা না পড়া, মনকে বাঁধতে পারে এমন কোন বাঁধন সংসারে নাই। সে যে সবার সাথে বন্দী হবার জন্য সন্ধি করে। আলোর মত, স্রোতের মত তার গতি, অনন্ত গতি। তাহাকে ধরে রাখবে কে? যত তার নানামুখী গতি থেকে সে একমুখী হয়ে আসবে, ততই শেষের দিকে সেই একমুখের

স্রোতও উল্টা দিকে বহিবে অর্থাৎ অন্তরমুখী হইতে থাকিবে ও সে স্রোত সহজ হয়ে আসবে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ কোনটাই গেল না। শুধু তাদের চাকরীর শেষ হোল। তারা পেনসন পেয়ে চলল মনের সঙ্গে, বিনা কাজে বাঁশী বাজিয়ে, খোকাকে স্নান করিয়ে, কাপড় চোপড় পরিয়ে, সাজিয়ে মায়ের ঘরে পৌঁছে দেবে বলে।

পথে আর একটি প্রাঙ্গন। সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেটা ভাবের রাজ্য। সেখানে আবার গ্রন্থি আছে। কতকগুলি প্রতিকূল। কতকগুলি অনুকূল। যাহারা বাধাস্বরূপ তাহারা মনরূপী চঞ্চল খোকাকে টানে। বলে, "বাইরে চল, বাহিরের ধুলোকাদাই ভাল, এতদিন যাহাতে পড়েছিলে সেই ত ভাল।" বিষয়ের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে, প্রত্যাগমন করার একটা আবেগ এখনও থাকে। আবার যদি ভাবরাজ্যের অনুকূল গ্রন্থিগুলির সাহায্য পাওয়া গেল তাহা হইলে শক্তি সঞ্চয় হয় ও এইরূপ দুর্ব্বলতার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থিগুলি স্থান ও কালের মধ্যে ছড়ানো থাকে। যেমন তীর্থস্থান গুলিতে শুদ্ধতা অর্জ্জন হয়। পূজাপার্ব্বণের দিনগুলিতে শুদ্ধ হবার আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। আবার যদি নিজের বাড়ীতে, একটা ঘরকে ঠাকুরঘরে পরিণত করা যায় তাহা হইলে জীবনে সেই ঘর আবার তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়ায়। যদি প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই ঘরে এসে অন্তরের অর্গল খুলে প্রতীক্ষা করা যায় তাহা হইলে সেই সময়টুকু পূজাপার্ব্বণের মর্য্যাদা লাভ করতে থাকে। যতই এইরূপ স্থান ও এইরূপ কালের পরিসর সাধনজীবনে বেড়ে যায় ততই ভাবরাজের অনুকূল গ্রন্থিগুলির সাহায্য পাওয়া যায়। ক্রমশঃ সর্ব্বস্থান, সকল সময়, তাঁরই বাসস্থান, তাঁরই আগমনের মুহূর্ত্ত বলে প্রতীয়মান হবে। আর ভয় নাই। মায়ের নাটমন্দির ত দুরে নহে। ঐ ত আগমনীর সুর বাজছে। বাজছে না? কার আগমনীর সুর? খোকা

জানে, মায়ের আগমনীর সুর। আর মা জানেন খোকার আগমনের সুর। কাহার আনন্দ বেশী? খোকা ভাবে তারই, মা জানেন, তাঁরই। সুর ত সেই একই। দু'জনকেই টানছে, কারণ তাহারা দুইজনেই ত মিলেমিশে এক।

ভাবরাজ্যের সকল সম্পদ যাহা মায়ের কথা বেশী করে স্মরণ করিয়ে দেয়, খোকা তারই মধ্যে খুঁজতে থাকে। সৎসঙ্গ ভাবরাজ্যের এইরূপ একটি অনুকূল গ্রন্থি, যাহা সাধককে যিনি সৎস্বরূপ তাঁর কাছে যাবার বার্ত্তা বেশী করে জানায়। মনে একটা দাবীর ভাব জেগে উঠে। পাব না কেন? নিশ্চয়ই পাব। সৎসঙ্গ এমনই জিনিষ যে মনের যাহা কিছু হাওয়া তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে ও একটা ছাপ রেখে যায়। যেমন প্রজাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হলে তার উপর রাজার বা রাজপুরুষের শিল মোহর পড়ে, সেই মত। মোট কথা, যেমন হাওয়ায় থাকবে সেই মত প্রভাবের ছাপ অন্তরে পড়বে। এতদিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাজ্যের প্রভাবে ছিলে। তারপর ভাবরাজ্যের প্রতিকূল আবর্ত্তের প্রভাবে পড়লে। এইবার ভাবরাজ্যের অনুকূল গ্রন্থিগুলি যতই ব্যক্ত হতে থাকবে ততই যাত্রা সুগম হবে। কিন্তু এগুলো গ্রন্থি, এদেরও ছাড়তে অর্থাৎ খুলতে হবে। যদি এদের নিয়ে জীবন কাটাও, সৎসঙ্গ নিশ্চয়ই পেলে কিন্তু পূর্ণ সচ্চিদানন্দকে ত আর পাওয়া হোল না। এইখানেই ত শ্রীকৃষ্ণের বাণী, 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ' এসে পড়ে। এস, তুমি আর পরাধীন থেকো না, যে সব বিধি, যে সব নিয়ম, যে সব বাহিরের সাহায্য (External aids) বরণ করে, আঁকড়ে ধরে ছিলে সে সমস্তই এইবার ছেড়ে যাবে। ছাড়তে হবে না। নিজেই ছেড়ে যাবে। ত্যাগ করতে হবে না। নিজেই ত্যাগ হয়ে যাবে। কেবল থাকবে একটি গ্রন্থি এখনও, তার নাম সংযম। যখন তাহা ব্রহ্মচর্য্যে পরিণত হবে,

তখন তাও আর তোমার হাতে গড়া নিগড় হবে না, ঈশ্বরের দেওয়া ফুলের মালারূপে তোমার গলায় শোভা দিবে, তোমার কপালে চন্দনের বিজয়টীকার মত সুন্দর দেখাবে। মা যে তাঁর ছেলেকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবেন। সংযম চেষ্টা, ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মের দেওয়া স্বাভাবিক ব্রত। সংযম চলবে যতদিন অভাববোধ আছে। ব্রহ্মচর্য্য পালন হবে যখন স্বভাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবেই মনে রেখো, আর একবার বলছি, ভাবরাজ্যের অনুকূল গ্রন্থি তিনটি—সৎসঙ্গ, ত্যাগ ও সংযম।

এইবার ভাবরাজ্যের পর অগ্রসর হও। শূন্যলোকে এসে পড়বে। মনে হবে সব স্থানটি বুঝি শূন্য, কিন্তু সাধুজন দ্বারা পরিবেষ্টিত এই স্থান। এই যে হাওয়ার স্তর যার মধ্যে জগতে আমরা বসে রয়েছি ও যাহাকে শূন্য বলে সর্ব্বদা মনে হচ্ছে, ইহাও শূন্য নহে। এখানেও সেই সাধুরা আসা যাওয়া করছেন। তাঁদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তাঁরা যে "নিসাড়" হয়ে আসা যাওয়া করতে ভালবাসেন। তাঁহারা সাধু অর্থাৎ স্বাদ পেয়েছেন, বুক ভরে গেছে, পেট ভরে গেছে। আর কি কোন শব্দ করতে পারেন? খালি কলসীতে জল ভরতে থাকলে শব্দ হয়। যে কলস রসে ভরে গেছে, আর সে রস যে সে রস নয়, একেবারে অমৃত, তাতে কি আর কিছু ভরবার স্থান থাকে? তাঁদেরও আর কিছুর জন্য আগ্রহ নাই। যতদিন জীবন থাকে, তা' সে যেপ্রকারের জীবন হউক না কেন, সবই ত মায়ের ইচ্ছা। সেই মত সাধুরা শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। এতে জগৎমণ্ডলের বায়ু শুদ্ধ হয়। যাহারা পথে অগ্রসর হতে চায়, অথচ পারছে না, তাদের সুবিধা হয়। মায়ের নিভৃত মন্দিরের এরা যে বেতনভোগী পাণ্ডা। এরা সঙ্গে থাকতে চায়, নব নব যাত্রীদের আগমনে নব নব আনন্দের ভাগ পায়। তাতে আনন্দ কমে না বরং বাড়ে।

সাধুসঙ্গ এই শূন্যলোকের গ্রন্থি বিশেষ এবং ইহা সর্ব্বোতভাবে অনুকূল। পিছনে ফিরবার আর ভয় নাই, সম্ভাবনাও নাই। এঁরা যদি একবার জড়িয়ে ধরেন, যদি একজনও জড়িয়ে ধরেন, আর রক্ষা নাই। মায়ের মন্দিরের ভিতরকার কপাটের চৌকাট পার করে দেবেনই দেবেন।

কিন্তু তাঁদেরও ছেড়ে যেতে হবে। তবেই না এটা একটা গ্রন্থি। খুলতে কষ্ট হবে কি? মাতা নিজের হাতে খুলে দেবেন। তিনি যখন খোকাকে চান আর কেহ কি খোকাকে ধরে রাখ্‌তে পারে? খোকা যখন এতদূর অগ্রসর হয়ে এল, মায়ের চৌকীর কিনারায় এসে ফিরে যাবে? মায়ের কোল পাবে না, চুম্বন পাবে না? তাও কি কখনও হয়। এখন আর কারুর সেখানে থাকলে চলবে না? খোকা যে মায়ের বুকে মাথা রেখে জানাবে যে তার শুধু এ জন্মের কেন, জন্মজন্মান্তরের সাধ পূর্ণ হোল।

তবে আর একটি গ্রন্থি তাহাকে অতিষ্ঠ করে দেবে। তার সাজ সজ্জা, জুতো মোজা, মালা চন্দন আর কি কাজে লাগবে? তার পৃথক সত্তা এখনও আছে বটে, এবার সেই গ্রন্থি মোচন হলেই সেইসঙ্গে সব বালাই দূর হইবে। "পর ধর্ম্ম ভয়াবহ"। এই "পর পর" ভাবটাই ত ভয়াবহ। "মা ও "আমি" আমরাও কি পর পর থাকব? নিজ কি নিজকে পাবে না? আপন কি আপনাতে মিলে যাবে না? জীবনের সকল স্তরে, সকল অবস্থায় ত এই একই সুরের আবেদন নিত্য চলছে। তবে এই আবেদনের চরম নিবেদন সাধক জানান যখন তিনি আর মায়ের কাছ থেকে পৃথক থাকতে পারেন না। যদি মরেও যাই, পর পর ভাব আর চলবে না। তাই গীতায় বলা হইয়াছে, "স্বধর্ম্মে নিধনম্ শ্রেয়"। চির জনম অভাবের কান্না গেয়ে, আজ যখন পরিপূর্ণ মাতৃদর্শন ঘটল, তখন কে আর ফিরে যায়? আর যাওয়া আসা কে চায়? আর

জন্মমৃত্যু কার ভাল লাগে? এইখানে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ সব শেষ হউক্। পথ ফুরাল। শিশু মন মরিল। মরিয়া বাঁচিল। মায়ের বুকে পৌঁছিয়া তাহার পৃথক অস্তিত্ব রহিল না। এবার সে অমৃতময় হয়ে গেল। এখন আর চিন্তায়, কথায়, কার্য্যে, অনুভূতিতে দ্বৈতভাব ফিরে আসবে না। ইহা সাধকের কল্পনা বা দৃঢ়তার জন্য নয়। ইহা মায়ের দেওয়া পূর্ণ অধিকার। ইহার পর জগৎসংসার সবই মায়ের বিভূতি বলিয়া প্রকাশ পাইবে। আবার শূন্য রাজ্য দিয়া, ভাব রাজ্য অতিক্রম করিয়া, বাস্তব রাজ্যে সাধক ফিরে আসবেন, নাও আসতে পারেন। তবে যদি আসেন অথবা যেখান পর্য্যন্ত মায়ের ইচ্ছামত আসেন কোন স্থান আর ত তাঁর পার হয়ে যাবার নয় যে অনুকূল বা প্রতিকূল হবে। এ সবই যে তিনি স্বয়ং। ভিতরে ব্রহ্ম, বাহিরে ব্রহ্ম, ভিতর বাহিরের সম্বন্ধ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই শুধু আছেন। ব্রহ্মই শুধু আছেন বলাও চলে না, তাহলে সেই সঙ্গে কালের সংজ্ঞা আবার ব্রহ্মের সমকক্ষভাবে এসে পড়ে। শুধু হাতটি জোড় করে বলা চলে ওঁ ব্রহ্ম। কিন্তু কে কার কাছে হাত জোড় করে? তা'ও ত আর হয় না।

খাওয়া, পরা, ঘুমান, এসব কি ভাবে চলবে? পথে চলতে চলতে নিয়ম অনেক এসেছিল। এখন নিয়ম কিছু থেকেও থাকবে না। আবার না থেকেও থাকবে। আমাদের প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেছে। আর এ বিষয়ে না বলাই ভাল।

মাতাজী কেমন সুন্দর খোকা ও মায়ের উপমা দ্বারা আমাকে বোঝালেন যে খোকা-মন আত্মার ঘরে পৌঁছাল। তবু কেন উপনিষদের একটি শ্লোক আমার মনে সন্দেহ আনিল যে এইরূপ কি করিয়া হয়? সেখানে বলা হইয়াছে, "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

অর্থাৎ সেখান হইতে অপ্রাপ্য মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে। তবে কি আত্মার ঘরে পৌঁছে মন আত্মার সহিত এক হইতে পারে না? তাহা না পারিলে পর, মাতাজীর শিক্ষা অনুসারে, বলিতে হইবে যে এইরূপ হইলে মানবসত্তার একীকরণ কি করিয়া সিদ্ধ হইবে? উপনিষদেও ত ইহা সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই শ্লোকটির অর্থ কি ভাবে বুঝিব? মাতাজীর প্রদর্শিত আলোতে আমি ইহার অর্থ নিজ অন্তরে যেমন বুঝিয়াছি লিখিয়া রাখি। এখানে "অপ্রাপ্য" মন শব্দটির অর্থ যথাসাধ্য আয়ত্ত করিতে হইবে। "অপ্রাপ্য" বলিতে সমগ্র মন বুঝাইতেছে না। মনের "অপ্রাপ্য" অংশ বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে। অতএব মনের "প্রাপ্য" অংশ আত্মায় রহিয়া যায়। ইহা কিরূপ অর্থ হইল? মাতাজীর ভাষা অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছা করে মনের খোসাটা বাক্যের সহিত ফিরে আসে, যখন খোকা মন কাপড় চোপড় ছেড়ে মায়ের (আত্মার) বুকে ঝাঁপ দিল। এবং মনের যে অংশ রয়ে গেল আত্মায়, তাহাই তাহার আসল সত্তা। অর্থাৎ সমগ্র মন আত্মাতে পৌঁছাইয়াও পৌঁছিল না কিংবা না পৌঁছাইয়াও পৌঁছাইল। উপনিষদের এই বাণীতে জোর করিয়া বলা হইয়াছে যে বাক্যের সহিত ভাব যেমন অনেকটা জড়িত, সেইভাবে মনও সংশ্লিষ্ট এবং সেই কারণে মনের সেই অংশ ঈশ্বরেতে পৌঁছাইয়াও পৌঁছাইতে পারে না। কিন্তু মনের সার সত্তা যে পৌঁছাইয়া যায় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ত এস্থলে ব্যক্ত করা হয় নাই।